ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

384661

Dhaka University Library
384661

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ফেরদৌসী নাশরিন বুলবুল

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিসেম্বর ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম

''বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের কার্যাবলী (১৯০৫-১৯৪৭)''

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম

384661

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ফেরদৌসী নাশরিন বুলবুল

এম,ফিল, গবেষক

রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১০১

সেশন ঃ ১৯৯২-৯৩

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

"যিনি আমায় জ্ঞান অন্বেষণে অনুপ্রেরণা দিয়ে এই অভিসন্দর্ভ রচনায় সর্বাধিক সহযোগিতা করেছেন সেই পরম শ্রদ্ধেয় আমার পিতা ডঃ নূর আহ্‌মেদ বুলবুলের নামে উৎসর্গ করলাম এই অভিসন্দর্ভখানি।"

384661

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি আনন্দের সাথে প্রত্যয়ন করছি যে, " বাংলাদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যাবলী (১৯০৫-১৯৪৭)'' শীর্ষক প্রণীত অভিসন্দর্ভটি ফেরদৌসী নাশরিন বুলবুল এর একক ও নিজস্ব গবেষণার ফলশ্রুতি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মৌলিক উৎস থেকে প্রণীত এবং এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। আমি অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপির প্রতিটি অধ্যায় অভিনিবেশ সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়ার অনুমতি প্রদান করছি।

১০.১১.২০০০ ইং

(ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম)

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের কার্যাবলী (১৯০৫-১৯৪৭) অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মরহুম অধ্যাপক ডঃ পি, আই, এস, মুস্তাফিজুর রহমানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং বর্তমান সময়ে প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম এর তত্ত্বাবধানে এই অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মরহুম তত্ত্বাবধায়কের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় আমি চির কৃতজ্ঞ। তাছাড়া গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের নির্দেশনা ও সহযোগিতা, অধ্যায় পরিকল্পনা এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অধ্যায় সঠিকভাবে সাজাবার ক্ষেত্রে ডঃ মোঃ ইব্রাহিম স্যারের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে আমার গবেষণাটি সমাপ্ত হতে পেরেছে।তাই আমি এই বিশাল হৃদয়ের মহান শিক্ষকের নিকট চির ঋনী।

উল্লেখ্য, এই অভিসন্দর্ভটি রচনা কালে আমাকে বিভিন্ন সময়ে এদেশের বিভিন্ন স্থানের গীর্জার ফাদার /পেষ্টর / ব্রাদারদের নিকট যেতে হয়েছে। যে সকল ফাদার ও পেষ্টর আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন তারা হচ্ছেন যথাক্রমেঃ

ফাদার বার্ণাড পালমা তার-অমূল্য তথ্য -" বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে খ্রীষ্টান সমাজের অবদান" দিয়ে তিনি আমাকে অভিসন্দর্ভটির কার্যে সহযোগিতা করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশ সেবক সমিতির ইতিহাস গ্রন্থের লেখক পেষ্টর টমাস মনিমোহন বৈদ্য আমাকে বাংলাদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যাবলী সম্পর্কে কয়েকটি তথ্যপূর্ণ-গ্রন্থাবলী যেমন ঃ

১। বাংলাদেশ সেবক সমিতির ইতিহাস, টমাস মনিমোহন বৈদ্য

২। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস, প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত।

Dhaka University Institutional Repository

৩। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস, রেভারেন্ড প্রিয় কুমার বারুই

৪। ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের ইতিহাস-রেভারেন্ড রাজেন্দ্রনাথ বাড়ৈ প্রভৃতি গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা এবং বনানী নেশনাল মেজর সেমিনারী লাইব্রেরীর বিভিন্ন গ্রন্থের লিষ্ট বা তালিকা দিয়ে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া কারিতাসের প্রেসিডেন্ট জেফ্রিয়াস পেরেরা (কারিতাস,২নং আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ ঢাকা, এবং মিরপুর সেন পাড়ায় অবস্থিত সি,সি,ডিবির শ্রদ্ধেয় সুশান্ত অধিকারী আমাকে বাংলাদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যাবলী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বলেই আমি আমার এ অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করতে পেরেছি। এবং এ ক্ষেত্রে আমি উনাদের সকলের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ফেরদৌসী নাশরিন বুলবুল ৩১/১২/২০০০ইং

(ফেরদৌসী নাশরিন বুলবুল)

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	১-৭
প্রথম অধ্যায়- খ্রীষ্ট ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।	৮-১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়- খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিভিন্ন বিভাগ; বিশ্বাস ও মতাদর্শগত পার্থক্য। (ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট)	১৭-৩৪
তৃতীয় অধ্যায়- দক্ষিণ এশিয়া বিশেষত বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাস ও ধর্ম জীবন; একটি পর্যালোচনা।	৩৫-৪১
চতুর্থ অধ্যায়- দক্ষিণ এশিয়া বিশেষতঃ বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের আগমনের পটভূমি বিশ্লেষণ আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা।	৪২-৬১
পঞ্চম অধ্যায়- বঙ্গ ভঙ্গ থেকে ভারত বিভাগঃ রাজনৈতিক পটভূমিতে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের কর্মকৌশল; তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক মাত্রা।	৬২-৯৮
৬ষ্ঠ অধ্যায়- বাংলাদেশের খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড।	৯৯-১২৫
সপ্তম অধ্যায়- বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের অবদানের ব্যাপ্তি ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়া	১২৬- ১৪৩
অষ্টম অধ্যায়- উপসংহার, খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের নাম ও তালিকা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের আর্ন্ত-সম্পর্ক।	১৪৪-১৭১
গ্রন্থপঞ্জী	
তথ্য নির্দেশিকা।	

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় যে, অন্যান্য ধর্মের মত খ্রীষ্ট ধর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যিক দলের সঙ্গে এদেশে আগমন করে। মুঘল আমলে পর্তুগীজ মিশনারীদের মাধ্যমে বঙ্গে প্রথম খ্রীষ্ট ধর্মের আগমন ঘটে এবং খ্রীষ্ট -দীক্ষিত স্থানীয় ভক্তদের সহযোগিতায় বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারিত হয়। উল্লেখ্য,বাংলাদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের আগমন সম্পর্কে এক একজন লেখক এক এক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। যেমন, ১৯৮৪ সালে লেখক শ্রী মথুরানাথ লিখিত " বংগে খ্রীষ্ট মন্ডলী " নামক বইটিতে ১৭৪০ থেকে ১৮৯২ সালে পর্যন্ত প্রোটেষ্টান্ট মন্ডলীর বিস্তৃতি এবং খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ প্রকাশ করেছে। ১৯৭৩ সালে রেভারেন্ড প্রিয় কুমার বারুই লিখিত " বঙ্গীয় খ্রীষ্টিয় মন্ডলীর ইতিহাস " পুস্তকখানিতে ১৫১৭ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বঙ্গ দেশে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার এবং তার বিস্তৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুস্তকখানি জাতীয় চার্চ পরিষদের সাহিত্য কমিটি কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৮৫ সালে অধ্যাপক দিলীপ পন্ডিত কর্তৃক রচিত বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস নামক পুস্তকখানি খ্রীষ্টীয়ান লিটারেচার সেন্টার কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে। এ পুস্তক থেকেও ১৫১৭ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার এবং বিস্তৃতি সমন্ধে জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, রেভারেন্ড প্রিয় কুমার বারুই, এবং প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত বাংলাদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের আগমন সম্পর্কে ১৫১৭ সালের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সুতরাং বলা যায় যে, পূর্ব বাংলায় খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল সুলাতানী যুগে (১৫১৭-১৫৭১) এই সময়ে রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী ছিল বাংলাদেশের প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় মন্ডলী। পর্তুগীজ নাবিক , বণিক, ও পাদ্রিরা ষোড়শ শতকে এর গোড়াপত্তন করেন।

১৫৭৬ সালে মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এ দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করা হয়। মুঘল শাসনামলে এদেশে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারে সচেষ্ট ছিল রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী, জেসুইট মিশনারী পর্তুগীজ খ্রীষ্টানগণ। উল্লেখ্য, ১৬-১৬২৯সাল পযন্ত তৎকালীন পূর্ব বাংলার খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাসে কি ঘটেছিল তা বিস্তারিত ভাবে জানা যায়নি। সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব এর কারণ। তাই এই সময়টিকে অন্ধকারের যুগ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সুলতানী এবং মুঘল শাসনামলে এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম এলেও তার সুপ্রতিষ্ঠা হয় বৃটিশ শাসনামলে। যদিও বৃটিশরা প্রত্যক্ষভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রসারে সহায়তা করেনি খ্রীষ্টান মিশনারীরাই খ্রীষ্টের শিক্ষা, ও আদর্শ প্রচার করেছেন এবং তাদের দ্বারাই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গঠিত হয়েছে ধর্ম পল্লী, ধর্ম প্রদেশ, ধর্ম কেন্দ্র, ও বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু আমার অভিসন্দর্ভে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যাবলির সময়কাল ১৯০৫ হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সেহেতু অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত না করলে এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের আগমনের ইতিহাস অজানা থেকে যাবে। তাই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করা হলো। সুতরাং আমার অভিসন্দর্ভের আলোচনার প্রথম অধ্যায় এদেশে খ্রীষ্টান ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ। তারপরেও বিভিন্ন অধ্যায় রয়েছে। আমার আলোচিত অভিসন্দর্ভটি সর্বমোট ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিভিন্ন অধ্যায়সমূহে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তৎকালীন পূর্ব বঙ্গে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কর্তৃক খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমাজ সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ফলাফল হয়েছিল সুদুরপ্রসারী।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মিশনারী কর্তৃক খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারিত হলে এদেশের বিভিন্ন জেলায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের তৎপরতায় বিভিন্ন দেশীয় মন্ডলী ও সেবক সমিতি গড়ে উঠেছিল যেমন গোপালগঞ্জের স্বাধীন মন্ডলী (১৮৭৪-১৯০১) বারপৈকা মন্ডলী (১৮৫৫)ধর্মপাল মন্ডলী (১৮৫৮)গৈলা (১৮৫৯) ও পাথর মন্ডলী, যা ছিল বরিশাল ও ফরিদপুর জেলায়। ঢাকা মন্ডলীর মধ্যে মুন্সীগঞ্জ মন্ডলী, লালবাজার, ঢাকা। কুমিল্লা মন্ডলী ছিল ঢাকা মিশনের অঙ্গীভুত (১৮২২) চট্টগ্রাম মন্ডলী (১৮১৩) কদমদী মন্ডলী খুলনা (১৮১৫) পাগলা সমিতি (১৮৮৫-১৯২২) সেবক সমিতি (১৯২২-১৯৮৫) ও বঙ্গীয় ব্যপ্টিষ্ট সংঘের (১৯২২) নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল দেশীয় মন্ডলীদের তৎপরতায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে খ্রীষ্টান ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারিত হলে অনেকেই খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকরা খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করতেন। মন্ডলী স্থাপনের সময়ে অনেক সঙ্গীত রচনা হতো যে সেগুলো সংগ্রহপূর্বক প্রকাশ করলে একাখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং এদেশের সমাজের শেকড়ে খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত চর্চা যে বিশিষ্ট ভুমিকা পালন করেছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে এদেশের সংস্কৃতি খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতিতে প্রবেশের মাধ্যমে এদেশের মানুষের ধ্যান ধারনায় অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছে। এর ফলে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার অবসান হয়ে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার যাত্রা হয়।

খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকরা ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আর তার ফলেই মিশনারীদের দ্বারা দেশের বিভিন্ন জেলায় মিশন স্কুল, মিশন বোর্ডিং ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হলে এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেকেই সুশিক্ষা লাভ করে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সে সময়ের বাঙ্গালী শিক্ষিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে যাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তারা হচ্ছেন যথাক্রমে ঃ

- রেভারেন্ড প্রিয়কুমার বারুই বি, এ (প্রেসবিটারীয়ান মন্ডলী) যিনি ১৯৩২ সালে মিশনারীরুপে রাজশাহীতে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন।
- মিঃ গিরীশ চন্দ্র চিসিম, গারো ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী (১৯৩৩-১৯৪০)
- রেভারেন্ড বিনয় ভূষণ সাংমা, ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনী (১৯১৬)
- মিঃ গোবিন্দ দারেং ও মিঃ কানাই লাল সাংমা , ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী (১৯২৮)

Dhaka University Institutional Repository

- রেভারেন্ড ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস, বি. এ ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ও সংঘের মিশনারী (১৯২৭-১৯৪২)
- রেভারেন্ড প্রসাদ চন্দ্র দাসের (ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের প্রচারক ১৯৩২) নাম উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ খ্রীষ্টীয় সমাচার প্রচারের মাধ্যমে বাংলার নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষা বিস্তারেও এগিয়ে এসেছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে সিষ্টারগণের নাম এদেশের ইতিহাসের পাতায় উজ্জল হয়ে থাকবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে সমাজে স্ত্রী শিক্ষার চর্চা নেই উন্নতি নেই, সে সমাজ কখনই প্রকৃতরুপে উন্নতি লাভ করতে পারে না। স্ত্রী জাতির উন্নতি ও অবনতিতে সমাজের যে উন্নতি ও অবনতি এ কথা পষ্ট। এ জন্যে কবি টেনিসন বলেছেন "Woman's cause is man's, they rise or sink together, dwarfed or god-like, bond or free".

আর এই সত্যি উপলব্ধি হয়েছে খ্রীষ্ট ধর্মে । এ কারণেই ফাদার ব্রাদারগণের পাশাপাশি এ দেশে নারী শিক্ষার ব্যাপারে সিষ্টারগণের ভুমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। পূর্ব বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষায় যে সকল সিষ্টারগণ এগিয়ে এসেছিলেন তারা হলেন যথাক্রমে মিস হার্সী, মিস উইটসম্যান, মিসেস নল, এ্যডিথ ল্যাংরিজ, হেষ্টার নকস , ফ্যানী ওলনী এ্যাডা এ্যাপেলবী এবং আরো অনেকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল সিষ্টারগণের প্রচেষ্টায় স্ত্রী শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে সমাজ উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক বঙ্গে রেনেসাঁস নামে চিহ্নিত । বাংলার রেনেসাঁস যদিও অনেকের কাছে সাম্প্রদায়িক মুষ্টিমেয় শ্রেণীজাত ও সীমিত বলে বিতর্কিত, তথাপি রেনেসাঁসে খ্রীষ্টানদের অবদান ছিল অপরিসীম। সেকালে বাঙ্গালীর পক্ষে যা করা সম্ভবপর হয়নি রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরী প্রমুখ তৎকালীন মিশনারীরা তা সম্পন্ন করেছিলেন। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি , শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের ফলে ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান ও দর্শন ভাবধারা ও মূল্যবোধের সাথে এদেশের অনেক জ্ঞানী মনীষী বুদ্ধিজীবি ও সমাজ সংস্কারকদের পরিচয় ঘটেছে। রেনেসাঁস যুগের লাল বিহারী দে, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ও মধুসূদন দত্ত প্রমূখ খ্রীষ্টান প্রতিভাবান ব্যক্তিরা রেনেসাঁস তরান্বিত করতে ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের পূর্বে বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে এদেশে জাতি ভেদ প্রথার বিলুপ্তি, সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব, রামকৃষ্ণ মিশনের দর্শন ও কার্যকলাপ এবং অহিংস নীতি প্রভৃতির মধ্যে খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধের প্রভাব লক্ষনীয়। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রেম ও ক্ষমা, ন্যায় বিনয় ও ধর্মভাব, কল্যাণ সেবা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি মূল্যবোধগুলি এদেশের সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর সূদুর প্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। অর্থনৈতিক কাঠামোতে দেখা যায় যে, খ্রীষ্ট ধর্মে পুঁজিবাদ কিংবা সাম্যবাদকে মূল্যায়ন করা হতো না দরিদ্রের অগ্রাধিকার দিয়ে গোটা মানব জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি করাই ছিল বা হচ্ছে খ্রীষ্টান ধর্মের মূল নীতি। তাই এদেশে যখন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারিত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

তখন দরিদ্র জনগণের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করে তাদেরকে খ্রীষ্ট ধর্মে আকৃষ্ট করা হতো।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এ কথাই প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠে যে, খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের ফলে খ্রীষ্টান সংস্কৃতি প্রবিষ্ট হয়ে এদেশের অর্থনীতি সমাজ সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এর ফলাফল হয়ে উঠেছিল আলোকময় ও সুদুর প্রসারী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

খ্রীষ্ট ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ।

"খ্রীষ্টান Term টি প্রথম ব্যবহৃত হত সিরিয়ার এন্টিয়োকের কিছু দলের লোকদের বুজাতে যারা "Christos" নামের সাথে সংযুক্ত ছিল । এই "Christos" শব্দটি গ্রীক শব্দ হতে উদ্ভব। ইহা ছিল হিব্রু শব্দ মাসীহ্ (Mishiah) থেকে অনুদিত।[১] আর এই মাসীহ হিব্রু শব্দ Mashiah (অর্থাৎ তেল লাগানো) হতে বুৎপন্ন এবং ইংরেজী Christ এর সমার্থক।

যাই হোক, এই "Christos" শব্দ দ্বারা ইহুদী খ্রীষ্টানদের জাতীয় পরিত্রান কর্তাকে বুঝানো হত।

খ্রীষ্টান ধর্মের উৎসসমূহ ঃ

খ্রীষ্টান ধর্মের উৎস সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে "The Jewish scripture, The earliest christians were jews, with the traditional threefold scriptures. Although christianity became an over whelmingly Gentile movement the Christian communities continued to read the scripture using them as an authoritative source for reaching and debate and seeing them as the old Testament for covenant' (6: Voll).[২]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, বর্তমানের খ্রীষ্টান জাতি ছিল ইহুদী। হরত মুসা আঃ ছিলেন ইহুদী জাতির জন্মদাতা। এই ইহুদী জাতির আচার রীতি নীতি বিশ্বাস ছিল Old Testament এর অর্ন্তগত।

যা ছিল ইহুদী জাতির ধর্ম শাস্ত্র। ইহুদী জাতির ধর্ম শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে খ্রীষ্টানদের New Testament এর যাত্রা শুরু হয়। বিশেষ করে হযরত ঈশা আঃ অর্থাৎ যীশু আঃ এর সময় থেকে এই Old Testament ও New Testament ছিল খ্রীষ্টান আন্দোলনের উৎস।[৩]

"যীশু ছিলেন নব্য খ্রীষ্ট বাদের জন্ম দাতা। Judea এর অর্ন্তগত বেথেল হামে Jesus বা যীশু আঃ এর জন্ম হয়। রোমান সম্রাটের গর্ভনর Herod তখন Judea এর শাসনকর্তা ছিলেন। যীশুর আর্বিভাবে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। যীশুর বংশ পরিচয় Mathew এবং Luke এই দুই Gospel এ দেয়া হয়েছে। তিনি Son of david, Son of Abraham রুপে কথিত হয়েছেন। এবং বলা হযেছে যীশু ও ইব্রাহীমের মধ্যে বিয়াল্লিশ পুরুষ এর ব্যবধান। অর্থাৎ ইব্রাহীম এবং দাউদ আঃ এর মধ্যে ১৪ পুরুষ এর ব্যবধান (Math 1,1.17)

Methew তে Abraham was the father of Isaac, Isaac of Jacob, Jacob of Judah ইত্যাদি বিন্যস্ত। কিন্তু Luke এর (3: 23:34) তা আরোহন পদ্ধতিতে সন্নিবিষ্ট । যীশু সম্পর্কে Mathew এবং Luke প্রভৃতি Gospel এ যীশুর জন্ম তারিখ পাওয়া যায়নি। শুধু পাওয়া গিয়েছে বংশ পরিচয়। তবে খ্রীষ্টীয় গির্জানির্ধারকগণ ২৫শে ডিসেম্বর তার জন্ম তারিখ নির্দেশ এবং

Dhaka University Institutional Repository

উহাতে জন্মোৎসব পালন করে থাকেন। কিন্তু সনের উল্লেখ পাওয়া যায়নি।[৪] বিশপ Barnes (Rise of Christianity p- 79) এ বলেন এই তারিখ অসম্ভাব্য।[৫]

যীশুর মিশন ঃ যীশুর সময় থেকে ব্যাপক মিশন কার্য শুরু হয়। যীশু প্রথম মিশন কার্য শুরু করেন সিরিয়া ও জেরুজালেমে। তখন ছিল রোমান সম্রাট Caeser সিজার এর শাসন কাল। যীশু Judaea এর মরু অঞ্চলে তার প্রচার কার্য শুরু করলে যিশুর লোক খ্রীষ্ট ধর্মের উপর বিশ্বাস এনে তাঁর (যীশুর) অনুসারী হয়। Herod যখন John the Baptist কে গ্রেফতার করে তখন যীশু Nazareth ত্যাগ করে Galilee সাগরের তীরবর্তী Capernaum-এ বসত আরম্ভ করেছিলেন এবং তথায় তার প্রচার কার্য শুরু করে বলেন " Repent; for the Kingdom of God is upon you" অথার্ৎ অনুতাপ কর; কারণ আল্লাহ্‌র রাজ্য তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। তিনি Synagogue (ইহুদীদের গীর্জা) এই সুসংবাদ প্রচার করতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে তাদের নানা রোগ ব্যধি হতে আরোগ্য করেছিলেন সিরিয়ায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল Galilee, Ten towns, জেরুজালেম, Judea এবং ট্রানস্ জরদান থেকে আগত বিশাল জনতা তার প্রচার সফরে অনুগামী হয়েছিল। যীশু কি প্রচার করতেন ? কুরআনে তাঁকে তওরাতের সত্যয়নকারী বলা হয়েছে। বাইবেলে এই কথার সমর্থন দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

যীশু বলতেন " কখনও মনে করিওনা, আমি আইন এবং নবীগণকে উৎখাত করতে (To abolish law and the prophets) এসেছি .....আমি বরং উহাকে পূর্ণত্ব প্রদান করব। [৬]

এভাবে যীশুর দ্বারা খ্রীষ্টান ধর্ম পূর্ণতা লাভ করে এবং বিভিন্ন জায়গায় মিশনের মাধ্যমে প্রচার হতে থাকে যা পরবর্তী সময়ে সারা বিশ্বে খ্রীষ্ট ধর্ম আলোড়নের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করতে থাকে।

তাই বলা হয়ে থাকে Christainity has existed for two millennia. It has sereral times changed its geographical centre of gravity. It has adapted itself to diverse societies and been reshaped by them. It has been the most syncretistic of all great faiths. While never losing the marks its jewish origins. There is no single christain civilization, but an endless process of translation in to various languages and cultures and into the various subcultures within them.[৭]

খ্রীষ্টান ধর্মের বিকাশ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব।

খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে Antioch এ যীশু কর্তৃক খ্রীষ্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্রমে হেলেনীয় সভ্যতায় তা ছড়িয়ে পড়েছিল বিশেষত

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীসে রাব্বী এবং সওল নামে দুজন সাধক (পরবর্তীতে সাধক হয়েছিলেন)। যারা যীশুর সঙ্গী না হয়ে ও যীশুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৮]

এভাবে একসময় হেলেনীয় সংস্কৃতিতে নতুন খ্রীষ্টীয় চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়। বিশেষত গ্রীক দর্শনতত্ত্বকে কেন্দ্র করে এই খ্রীষ্টীয় চিন্তাধারা যুক্তির উপর ভিত্তি করে করে গড়ে উঠে গ্রীসে অর্থোডক্স খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ভিত্তি তৈরী করেছিল।[৯]

এই অর্থোডকস মন্ডলীতে যে দেশগুলি প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ-রাশিয়া, রুমানিয়া, বলকান অঞ্চল ও গ্রীস প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপের দেশেসমূহ।[১০]

যীশুর আর্বিভাবের পর খ্রীষ্টীয় চিন্তা ধারায় আর একটি খ্রীষ্টান মন্ডলীর উদ্ভব ঘটায় যা ক্যাথলিক মন্ডলীরুপে পরিচিত। উল্লেখ্য, রোম সাম্রাজ্য ছিল প্রথম খ্রীষ্টান সাম্রাজ্য যেখানে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বাস। ক্যাথলিক মন্ডলীর অন্তর্ভূক্ত দেশগুলি হচ্ছে যথাক্রমেঃ-ইটালী,স্পেন,পর্তুগাল,ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ডের বনাঞ্চল, দক্ষিনজার্মানী, আয়ারল্যান্ড, পোলান্ড, লিথুয়ানিয়া,চোকাস্লাভাকিয়া,হাঙ্গেরী,উত্তর যুগোশ্লাভিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা,মধ্য আমেরিকা,মেক্সিকো, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, কানাডার কুইবেক এবং ফিলিপাইনের অধিকাংশ খ্রীষ্টান রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীর সদস্য। এ হচ্ছে ক্যাথলিক মন্ডলীর বর্তমানের রুপরেখা।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য,বহু ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রাচীন যুগ অতিক্রম করে মধ্যযুগে এর বিকাশ ধারা অব্যাহত রেখেছিল বলেই হেলেনীয় সভ্যতা এবং আফ্রিকার বারবারিয়ান সভ্যতা অতিক্রম করে নাটকীয়ভাবে ১৫৫০ সালে স্পেনে, ১৬৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত পর্তুগালে, আফ্রিকার দীপপুঞ্জ এবং ককেশাস অতিক্রম করে পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, ইংল্যান্ড, উত্তর আমেরিকা ,উত্তর ইউরোপ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে আলোচিত অধ্যায়ে পরিণত হয় যা খ্রীষ্টান ধর্ম বিকাশের ইতিহাসে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

''ষোড়শ শতাব্দীর খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাসে প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্ট মন্ডলী উদ্ভবের মধ্যে দিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৫১৭ সালে একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত অধ্যাপক মার্টিন লুথার রোমের পোপের আধ্যাত্মিক আধিপত্য ও কয়েকটি সংস্কারের বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপে প্রোটেষ্টান্ট (প্রতিবাদ) আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে প্রোটেষ্টান্ট মন্ডলীর উদ্ভব হয়। প্রোটেষ্টান্ট মন্ডলীর অর্ন্তভূক্ত দেশসমূহ হচ্ছে যথাক্রমে উত্তর ও মধ্য জার্মানী,নরওয়ে, সুইডেন,ফিনল্যান্ড, এষ্টোনীয়া, লাটভিয়া, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড,ইংল্যান্ড, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র,কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের অধিকাংশ খ্রীষ্টান প্রোটেষ্টান্ট।[১২]

অর্থোডিকস, রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদয়ের মধ্যে সাংগঠনিক ও তত্ত্বগত বহু অমিল থাকলেও একটি মৌলিক বিষয়ে মিল রয়েছে, তা হলো যীশু খ্রীষ্টকে তিন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানরাই ঈশ্বরের পুত্র ও পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

করেন। যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র এবং পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস করাই খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ভিত্তিভুমি।[১৩]

এই কারণে বর্তমান বিশ্বের খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ''বিভক্ত রাজ্য'' অথবা ''বিভক্ত পরিবার আখ্যা দেয়া যায় না; বরং খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর বিভিন্নতাকে'' অমিলের মধ্যে একতা (Unity in diversity) বলাই সমীচীন।

বিভিন্ন মন্ডলী সহকারে এক বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্ট ধর্মের বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দিতে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারিত বিভিন্ন ধর্মের সারিতে প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটিকাসমূহ

১। A hand book of living religions
edited by john and Hinnells
Viking
First published 1964
P- 56

২। Bosch D, witness to the world, The christian mission in theological perspective.
Atlanta, Ga, John knox 1980
P-

৩। A hand book of living religions
Edited by john and Hinnells
P-56-57

৪। ইসলামী বিশ্বকোষ
৫ম খন্ড
পৃঃ- ২১৫,৫০৬

৫। Rise of christianity
Barnes
P-79.

Dhaka University Institutional Repository

৬। ইসলামী বিশ্বকোষ
১ম খন্ড
পৃঃ- ২১৭-১৮

৭। A hand book of living religions
Edited by john and Hinnells
First published 1984
P-58

৮। Do,P-59

৯। Do,P-60

১০। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
পৃঃ- ১৯ ।

১১। ঐ,পৃঃ-১৯

১২। ঐ,পৃঃ-১৯

১৩। মথি ১৬ ঃ ১৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিভিন্ন বিভাগ বিশ্বাস ও মতাদর্শগত পার্থক্য। (ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট)

মূলত মিশনারীদের বিভিন্ন বিভাগের উৎপত্তি হয়েছে রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীকে কেন্দ্র করে ১৫১৭ সালে রোমের পোপের বিরুদ্ধে প্রোটেষ্টান্ট (প্রতিবাদ) আন্দোলনের মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী অতি প্রাচীন মন্ডলী। গ্রীক ভাষা থেকে উদ্ভুত ক্যাথলিক শব্দটির অর্থ হল সার্বজনীন রোমের বিশপের (অর্থাৎ পোপ মহোদয়ের) সঙ্গে যে সকল খ্রীষ্ট মন্ডলী যুক্ত তাদের ক্যাথলিক মন্ডলী বলা হয়। আনুমানিক ১০৭ খ্রীষ্টাব্দে আন্তিয়োকের সাধু ইগ্নোসিউস্ খ্রীষ্ট মন্ডলীকে এই নামটি দিয়েছিলেন। ক্যাথলিক শব্দটি সার্বজনীন অর্থ ছাড়াও অন্যান্য অর্থে ব্যবহার হয়, যেমন ক্যাথলিক স্কুল, প্রেস কিংবা উপাসনা একজন ভাল ক্যাথলিক। ক্যাথলিক মন্ডলী সকল জাতি ও কৃষ্টির কাছে মঙ্গল সমাচার প্রচার করে।[১]

যারা খ্রীষ্ট বিশ্বাস গ্রহণ করে তারা নিজ নিজ কৃষ্টি অনুসারে তা প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে ক্যাথলিক মন্ডলীতে বিচিত্রতার মাধ্যমে একতা প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

"ক্যাথলিক প্রাচ্য মন্ডলী সমূহ (**Eastern Catholic Churches**)ঃ- প্রাচ্য উপাসনা পদ্ধতি অনুসারে ক্যাথলিক মন্ডলীগুলোর সদস্য সংখ্যা সারা পৃথিবীতে প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ। শুরুতে কনষ্টান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া, আন্তিয়োক এবং জেরুজালেমের উপাসনা রীতিগুলোকে কেন্দ্র করে প্রাচ্য মন্ডলীগুলো গড়ে উঠে। বর্তমানে পাঁচটি প্রধান উপাসনা পদ্ধতি হচ্ছে বাইজেন্টাইন, আলেকজান্দ্রিয়ান , আন্তিয়োখিন, আর্মেনিয়ান ও ক্যাল্ডিয়ান। প্রাচ্য ক্যাথলিক মন্ডলী বিষয়ক দলিলে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা বলে "মন্ডলীসমূহের প্রতিষ্ঠানগুলো, এদের উপাসনা পদ্ধতি, মান্ডলিক ঐতিহ্য সমূহ এবং এদের খ্রীষ্টীয় জীবনবিন্যাস এসবই ক্যাথলিক মন্ডলী অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। কারণ এ সব মন্ডলী তাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীনত্বের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, আর এ সব মন্ডলীতে সুপষ্ট ঐতিহ্য বিরাজমান, যা পিতৃগণের মাধ্যমে প্রেরিত শিষ্যদের কাছ থেকে এসেছে, আর যা ঐশ প্রকাশিত ও সার্বজনীন মন্ডলীর অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকারের অংশ স্বরূপ" ক্যাথলিক প্রাচ্য মন্ডলী পোপ বা বিশপকে প্রভুর সমতূল্য ধারনা করে থাকে। পোপ শব্দটি গ্রীক ভাষা " পাপাস" (Papas) হতে নেয়া হয়েছে যার অর্থ 'পিতা' যিনি রোমের বিশপ বলে পরিচিত। তিনি খ্রীষ্টের প্রতিনিধি, সাধু পিতরের উত্তরাধিকারী । সর্বপ্রধান ধর্মাধ্যক্ষ, রোমের ধর্মাধ্যক্ষ , মান্ডলিক আইনে তাঁর ভূমিকার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, রোমের বিশপকে যীশু পিতরের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা প্রদাণ করেছেন, যিনি সর্বপ্রথম প্রেরিত শিষ্য ছিলেন। যে উত্তরাধিকারীর উপর এই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, তিনিই বিশপ সম্মেলনীয় প্রধান হবেন। খ্রীষ্টের প্রতিনিধি এই পৃথিবীকে সার্বজনীন মন্ডলীর পালক, তাই তার দায়িত্ব অনুসারে তিনি মন্ডলীতে সর্বোচ্চ, পরিপূর্ণ,

Dhaka University Institutional Repository

তাৎক্ষনিক ও সার্বজনীন ক্ষমতার অধিকারী। সেই ক্ষমতা তিনি মুক্ত ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।[২]

উপরিক্ত ক্ষমতা বলে রোমের পোপের বা বিশপের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেলে ষোড়শ শতাব্দীতে মন্ডলীর অপব্যবহার (দন্ডমোচন সমন্ধে) এর বিরুদ্ধে জার্মানীর একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত মার্টিন লুথার ১৫১৭ সালে প্রোটেষ্টান্ট (প্রতিবাদ) আন্দোলন করেছিলেন। মার্টিন লুথার ক্যাথলিক কিছু মৌলিক শিক্ষা ও আদিপাপ, পাপ মুক্তি, বিশ্বাস এবং সংগঠন রীতি উদাহরণস্বরুপ পোপীয় প্রাধান্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে এই প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এই প্রতিবাদ আন্দোলনের ফলে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভক্তি আসে এবং প্রোটেষ্টান্ট মন্ডলীর জন্ম হয়।[৩]

উল্লেখযোগ্য যে, মধ্যযুগে (১৩-১৫ শতাব্দী) মন্ডলীর ধর্ম সংস্কারের কথা শুনা যায়। এই ধর্ম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল মন্ডলীর কর্তৃপক্ষদের মধ্যে (in capite, আক্ষরিক অর্থে মাথায়) এবং মন্ডলীর সাধারণ খ্রীষ্ট ভক্তদের মধ্যে (In Membris, আক্ষরিক অর্থে দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গে) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা বারংবার বলে যে, মন্ডলীকে মঙ্গল সমাচারের আলোকে এবং পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় নিজের নবায়নের কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।[৪] ক্যাথলিক মন্ডলীর এই নবায়ন অর্থাৎ প্রোটেষ্টান্ট আন্দোলনের ফলে সারা বিশ্বের খ্রীষ্টানগণ তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রোটেষ্টান্ট আন্দোলনের পূর্বে খ্রীষ্টানগণ দুটি প্রধান সম্পদায়ে বিভক্ত ছিল। যথা-

Dhaka University Institutional Repository

১। রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী।

২। অর্থোডক্স মন্ডলী।

মর্টিন লুথার কর্তৃক ১৫১৭ সালে প্রোটেষ্টান্ট আন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। এই তিনটি সম্প্রদায় হলো যথাক্রমে

(১) রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী ঃ- ইটালী, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ডের বনাঞ্চল, দক্ষিণ জার্মানী , আয়ারল্যান্ড, পোলান্ড, লিথুয়ানিয়া, চেকোস্লাভাকিয়া , হাঙ্গেরী, উত্তর যুগোস্লাভিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা মেক্সিকো, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, কানাডার কুইবেক এবং ফিলিপাইনের অধিকাংশ খ্রীষ্টান রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীর সদস্য।

(২) অর্থোডক্স্ মন্ডলীঃ- প্রধানতঃ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি যথা, রাশিয়া, রুমানিয়া, বলকান অঞ্চল ও গ্রীস এই মন্ডলীর অন্তর্ভূক্ত।

(৩) প্রোটেষ্টান্ট মন্ডলীঃ- উত্তর ও মধ্য জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, লাটভিয়া, হলান্ড, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ও নিউজিল্যান্ডের অধিকাংশ খ্রীষ্টান প্রোটেষ্টান্ট মতাবলম্বী।[৫] ১৭১৫ সালে প্রোটেষ্টান্ট আন্দোলনের ফলে প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের জন্মের মধ্যে দিয়ে প্রোটেষ্টান্ট মিশনারীদের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের উদ্ভব হয়। আর প্রোটেষ্টান্ট মিশনারীদের বিভিন্ন বিভাগ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে কর্মতৎপর থেকে আলোচিত অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, ক্যাথলিক খ্রীষ্টানগণ শুধু একটি শ্রেণীর অর্ন্তগত হলেও জেসুইট এবং পিমে (P. I. M.E) এই একই ক্যাথলিক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী নিয়ে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। বাংলাদেশে এই বিভাগগুলো হলো যথাক্রমেঃ

১। ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী ১৭৯৬-১৯৪৭

২। অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট মিশন, ১৮৬৫-১৯৪৭

৩। অক্সফোর্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন, ১৯০৫-১৯৪৭

৪। নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন, ১৮৯০-১৯৪৭

৫। ইংলিশ প্রেসবিটারীয়ান মিশন, ১৮৬২-১৯৪৭

৬। ওয়েলশ্ প্রেসবিটারীয়ান মিশন, ১৮৮০-১৯৪৭

৭। চার্চেজ অব গড মিশন, ১৯০৫-১৯৪৭

৮। লুথারেন মিশন,১৯০২-১৯৪৭

৯। সেন্টএন্ড্রুজ মিশন/ হালুয়াঘাট-

১০। এ্যাংলিকান মন্ডলী ১৮০৫-১৯৪৭

১১। এ্যাশেম ব্রীজ অব গড মিশন

বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ের মিশনারীগণ তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ের পথ অতিক্রম করে জনগণের

Dhaka University Institutional Repository

সংস্পর্শ থেকে বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে বিশেষ করে ধর্মীয় জনকল্যাণমূলক এবং শিক্ষামূলক কার্যাবলীর মধ্যে দিয়ে নিজেদেরকে কর্মতৎপর রেখে আলোচনার বিষয়ে পরিনত হয়েছেন। যা বাংলাদেশের জনগণের নিকট বর্তমানেও উজ্জল হয়ে রয়েছে। তবে তৎকালীন পূর্ব বঙ্গে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান মিশনারীগণের ভুমিকা ও উল্লেখযোগ্য । নিম্নে এই প্রোটেষ্টান্ট ও ক্যাথলিক মিশনারীদের বিশ্বাস ও মতাদর্শগত পার্থক্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

প্রৈরিতিক বিশ্বাস সূত্রঃ- প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হচ্ছে প্রৈরিতিক বিশ্বাস সূত্র। বহু শতাব্দী যাবৎ ইহা প্রচলিত হয়ে আসছে। এই বিশ্বাস অনুযায়ী প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কর্তা, সর্বশক্তিমান পিতা, তারা আরো বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের একজাত পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টে। যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হয়েছিলেন। কুমারী মরিয়ম জন্মিলেন। পন্তীয় পীলাতের সময়ে দুঃখভোগ করিলেন। ক্রুশ বিদ্ধ হলেন। মরিলেন ও কবরস্থ হলেন পরলোকে নামিলেন তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হতে পুণরায় উঠিলেন, এবং স্বর্গে আরোহন করলেন। এবং সর্ব শক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসে আছেন। তথা হতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আসবেন। প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণ পবিত্র আত্মায় পবিত্র বিশ্ব ব্যাপী মন্ডলীতে বিশ্বাসীর সহভাগিতায় , পাপমোচনে শারীরিক পুনরুত্থানে ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করেন। মন্ডলীর প্রতিজ্ঞা পত্র, প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণ প্রতিজ্ঞা পত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। প্রতিজ্ঞা পত্র অবগাহন প্রার্থীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি উপদেশ মালার ভিত্তি ও হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে। উপসনায়, বিশেষতঃ নূতন বৎসরে অথবা বৎসরের প্রথম রবিবারে প্রভুর ভোজের সময় তা আবৃত্তি করা যেতে পারে।

১। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ অনুযায়ী প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণ এক ও অদ্বীতিয় এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁহাকে তারা প্রভু যীশুর মাধ্যমে পিতা বলে জানতে পেরেছেন।

২। তারা একজাত পুত্র খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস করেন। যিনি মরিয়মের পেটে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্যরূপ ধারন করেছিলেন। তিনি সেবাধর্মী জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করিলেন। পন্তীয় পীলাতের সময় ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মরিলেন। তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন ও স্বর্গারোহন করিলেন। তারা যীশুকেই এানকর্তা ও প্রভু বলে স্বীকার করেন। রাজত্ব করার জন্য তিনি আবার আসবেন বলে বিশ্বাস করেন।

৩। এই সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণ ঈশ্বরের পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করেন। আরো বিশ্বাস করেন যে, তিনিই প্রভু ও জীবন দাতা। তিনিই সমস্ত সত্য প্রকাশ করেন। এবং তিনিই সেই সহায় যিনি খ্রীষ্ট বিশ্বাসী সকলের অন্তরে বাস করেন ও তাদের নিশ্চিতে অনুমতি দেন যে, তারা অর্থাৎ খ্রীষ্টানগণ ঈশ্বরের সন্তান। খ্রীষ্টের সদৃশ্য হবার জন্য তিনি তাদেরকে পবিত্র করেন এবং সকল বিশ্বাসীকে পরস্পরের সহভাগিতায় সংঘবদ্ধ করেন।

৪। প্রোটেষ্টন্ট খ্রীষ্টানগণ আরো বিশ্বাস করেন যে, যীশু-খ্রীষ্টতেই-বিশ্বাসেই পরিত্রান লাভ হয়। যে তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে সে

Dhaka University Institutional Repository

ইহকালে পাপের ক্ষমা ও নতুন জীবন প্রাপ্ত হয়। এবং ঈশ্বরের সাথে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়।

৫। তারা বিশ্বাস করেন যে, খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের দ্বারা মন্ডলী গঠিত ও তারা ঈশ্বরের প্রজা। খ্রীষ্ট মন্ডলীর মস্তক ও মন্ডলী তাঁর দেহস্বরূপ।তার উপর নির্ভরশীল হয়ে মন্ডলী জগতের নিকট খ্রীষ্টীয় জীবন প্রকাশ করতে আহুত।

৬। প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণ বিশ্বাস করেন অবগাহন ও প্রভুর ভোজে যা ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাহ্যিক নিদর্শন ঃ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বাসীগণ তাদের বিশ্বাস প্রকাশ্যে স্বীকার করে এবং খ্রীষ্টের সাথে তাদের সংযোগ ও তাঁর উপরে নির্ভরশীলতা প্রকাশ করে।[৬]

ক্যাথলিক সম্প্রদায় খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসঃ- ক্যাথলিক খ্রীষ্টমন্ডলী এক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করে প্রভুর প্রার্থনা সম্পন্ন করে থাকেন। প্রভুর প্রার্থনার পর যীশুর মাতা মরিয়মের উদ্দেশ্যে দূতের বন্ধনা বা প্রণাম মারীয়া সম্পন্ন করেন যা প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণ করেন না। তাছাড়া পবিত্র ত্রিত্বের জয় অর্থাৎ প্রভু, প্রভু পুত্র এবং পবিত্র আত্মার জয় কামনা করে থাকেন। তাদের বিশ্বাসের চারটি মূল সত্য হলোঃ

১। এক ঈশ্বর আছেন।

২। এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তিঃ পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মা।

৩। পুত্র ঈশ্বর ক্যাথলিকদের পরিত্রানের জন্য মানুষ হয়েছেন এবং ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে প্রান ত্যাগ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪। ঈশ্বর ধার্মীককে স্বর্গের অনন্ত পুরস্কার ও পাপীকে নরকের অনন্ত দন্ড প্রদান করেন।[৭] রোমান ক্যাথলিকদের সাতটি সংস্কার বা Sacrament রয়েছে। ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের সাতটি Sacrament (সেক্রামেন্ট) বা সংস্কার আলোচনা করার পূর্বে জানা দরকার সংস্কার বা Sacrament। Sacrament বা সংস্কার ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মতে প্রসাদ পাবার জন্য যীশু খ্রীষ্ট যে সাতটি বাহ্য চিহ্ন নির্দিষ্ট করেছেন তাই সংস্কার বাহ্য চিহ্নের সাহায্যে ক্যাথলিকদের আত্মায় যীশু আশ্চর্য্য কাজ করেন ও প্রসাদ দেন। বাহ্য চিহ্ন হলো যে কাজ দেখতে পাওয়া যায় এবং যে কথা শুনতে পাওয়া যায়। সংস্কার সাতটি হলো যথাক্রমেঃ-

১। দীক্ষা স্নান
২। পাপ স্বীকার
৩। খ্রীষ্ট প্রসাদ
৪। হস্তার্পন
৫। রোগীলেপন
৬। যাজকত্ব বরণ
৭। বিবাহ।

এখন এ সংস্কার গুলো পর্যায় ক্রমে আলোচনা করা হলো।

১। **দীক্ষা স্নান (বাপ্তিস্ম)**ঃ ক্যাথলিকদের বিশ্বাস মতে যে সংস্কারে ক্যাথলিকরা ঈশ্বরের প্রসাদ অর্থাৎ নূতন জীবন লাভ করে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠা হয় তাই দীক্ষা স্নান। দীক্ষা স্নানে মৌখিক পাপের ক্ষমা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সাধারণত যাজক গণ এই দীক্ষা স্নানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকেন।

২। **পাপ স্বীকার সংস্কারঃ-** ক্যাথলিকদের বিশ্বাস যে, যে সংস্কারে দীক্ষা স্নানের পরে কৃত পাপের ক্ষমা হয় তারই নাম পাপ স্বীকার। পাপ স্বীকারের সময় পুরোহিত পাপ শুনেন উপদেশ ও দন্ড দেন এবং যীশুর নামে পাপ ক্ষমা করেন। ক্যাথলিকদের মতে পাপ স্বীকারে পাপের জন্য প্রকৃত অনুতাপ ও পুরোহিতের কাছে পাপ বলা এবং পরে দন্ড পুরুন করা কর্তব্য। তাদের মতে পাপ স্বীকার না করলে পাপের ক্ষমা হয় না। তাই পাপ স্বীকার অবশ্য করণীয় কাজ।

৩। **খ্রীষ্ট প্রসাদ সংস্কার বা Communion** ঃ- ক্যাথলিকদের মতে খ্রীষ্ট প্রসাদ সংস্কার রুটি দ্রাক্ষারসের আকারে যীশুর শরীর ও রক্ত খ্রীষ্ট যাগে প্রতিষ্ঠার কথায় রুটি ও দ্রাক্ষা রস যীশুর শরীর ও রক্ত হয়ে যায়। তাদের মতে প্রতিষ্ঠার পরে রুটি ও দ্রাক্ষারস থাকে না কিন্তু আকার অর্থাৎ রং, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি আগের মতই থাকে, তবে যীশু জীবিত ঈশ্বর ও মানুষ বলে সম্পূর্ণরুপে রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে উপস্থিত থাকেন। এই খ্রীষ্ট প্রসাদের মাধ্যমে শুধু যীশুকেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর এই খ্রীষ্ট প্রসাদের মাধ্যমে যীশু ক্যাথলিকদের আত্মার জীবন ও আহার হবার জন্য নিজেকে দান করে থাকেন। তাদের মতে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানকালে খ্রীষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করা আবশ্যক। এমনকি সম্ভব হলে প্রতিদিন খ্রীষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত । ক্যাথলিকদের খ্রীষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

প্রাসাদ গ্রহণের আগে পূর্ব এক ঘন্টা যে কোন কঠিন ও তরল খাদ্য হতে উপবাস করতে হয়, তবে সাধারণ জল যে কোন সময়ে পান করা যায়।[৮]

৪। **হস্তার্পনঃ**- যে সংস্কারে পবিত্র আত্মাকে পেয়ে খ্রীষ্টের বলবান শিষ্য সেনা ও স্বাক্ষী হয় তাই হস্তার্পন।দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় গৃহীত হয় যে হস্তার্পন সংস্কার প্রদানকারী সমন্ধে প্রাচ্য খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে যে, সব প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি বিদ্যমান ছিল সে সব সম্পূর্ণভাবে পুর্নবহাল করতে হবে। তদানুসারে বিশপ বা প্যাট্রিয়ার্ক কর্তৃক আর্শীবাদ ও পবিত্র (ক্রিসম) তেল ব্যবহার করে একজন পুরোহিত এ সংস্কার প্রদান করতে পারেন।[৯]

৫। **রোগী লেপনঃ**- যে সংস্কারে পুরোহিত প্রার্থনা করতে করতে রোগীর গায়ে পবিত্র তেল লেপন করেন, তারই নাম রোগী লেপন। তাদের মতে রোগী লেপনের ফলে রোগী সান্তনা ও বল পায়। পাপের ক্ষমা পায় এবং সোজা স্বর্গে যাবার যোগ্য হয়। এমন কি ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে রোগী সুস্থ্য হয়ে উঠে।[১০]

৬। **যাজকত্ব বরণঃ** যে সংস্কারে মানুষ যীশু খ্রীষ্টের প্রতিনিধি হন এবং মন্ডলীর কাজ সম্পন্ন করার অধিকার ও প্রসাদ পান তাই যাজকত্ব বরণ। যেখানে স্থায়ী পরিসেবক পদ অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে, পুণ্য মহা সভা চায় যেন সেখানে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় যাতে যাজক বরণের প্রাচীন ব্যবস্থাটি প্রাচ্য

Dhaka University Institutional Repository

মন্ডলীসমূহে পুনরায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে। উপ-পরিসেবক পদ (Subdiaconate) ও তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের পদগুলোর জন্য এবং তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে নীতি প্রণয়ন করা প্রতিটি স্বতন্ত্র মন্ডলীর আইনানুগ কর্তৃপক্ষের কর্তব্য।[১১]

৭। **বিবাহ ও মিশ্র বিবাহের বিধি নির্দেশঃ-** যে সংস্কারে নারী ও পুরুষদের মধ্যে পবিত্র ও চিরজীবনের সমন্ধ স্থাপিত হয় তাই বিবাহ। প্রাচ্য ক্যাথলিক ও প্রাচ্য অক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত হলে অসিদ্ধ বিবাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এবং বিবাহের দায়িত্ব, পবিত্রতা এবং পরিবারের শান্তি বৃদ্ধির জন্য পুণ্য মহাসভা অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাটিকান মহা সভা এই বিধি নির্দেশ জারী করছে যে, এ ধরণের বিবাহ অনুষ্টানের যে ক্যাথলিক আইনানুগ ''মন্ত্র'' রয়েছে তার বাধ্যবাধকতা শুধু মাত্র বৈধতার জন্য একজন যাজক কিংবা পরিসেবকের উপস্থিতিই যথেষ্ঠ , যদি মন্ডলীর আইনের অন্যান্য সমস্ত বিধি যথাযথ পালন করা হয়। আলোচিত এই সাতটি সংস্কার বা Sacrament ক্যাথলিক মন্ডলী যথাযথভাবে পালন করে থাকে।

বিশ্বাস ও মতাদর্শগত পার্থক্যঃ- প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণ যীশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করেন। তাদের মতে "He (Jesus) himself is God" কিন্তু ক্যাথলিকগণ এক ঈশ্বরের তিন সত্তায় অর্থাৎ ঈশ্বর, ঈশ্বর পুত্র, ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করেন। ক্যাথলিকগণ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

যীশু খ্রীষ্ট যেহেতু বিয়ে করেননি সেহেতু রোমান ধর্মযাজকগণ বিয়ে না করে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করে থাকেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে রোমান ধর্মযাজককে খ্রীষ্টীয় আদর্শ অনুসরন করতে বলা হয়েছে বিধায় রোমান ধর্মযাজক বিয়ে না করে ধর্মমত প্রচার করতে পারেন। কিন্তু প্রোটেষ্টান্ট ধর্মযাজকগণ বিয়ে করে ধর্মপ্রচার করে থাকেন। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণের পুরোহিতদের বিবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবিরোধ রয়েছে বলেই ক্যাথলিক পুরোহিতদের ফাদার বলে আখ্যায়িত করা যায় কিন্তু প্রোটেষ্টান্ট পুরোহিতদের Pestor বা Reverend বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান্টদের মতে ১২ বৎসর বয়সে অবগাহন করা যায়। কিন্তু ক্যাথলিক খ্রীষ্ট ধর্ম মতে অবগাহনের কোন বাধা ধরা নিয়মকে প্রাধান্য দেয়া হয়নি। অর্থাৎ ক্যাথলিক খ্রীষ্টানগণ অবগাহনের এক মাসের মধ্যে বাপ্তিস্ম করতে পারেন। নিজ বাবা/ মা ছাড়া ধর্ম বাবা/ মায়ের উপস্থিতিতে যাজকের আর্শিবাদে অবগাহন করা যায়। কিন্তু প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণের মতে ১২ বৎসর বয়স অবগাহন হবার বয়স। অর্থাৎ প্রোটেষ্টান্টদের মধ্যে অবগাহনের ক্ষেত্রে বয়সকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ক্যাথলিক ধর্ম মতে সাত বৎসর বয়সকে পাপ স্বীকারের বয়স বলা হয়। সাত বৎসর বয়সে প্রত্যেক শিশু নিজের ভাল/ মন্দ কিছুটা হলেও বুঝতে পারে। সুতরাং সাত বৎসর বয়সই পাপ স্বীকারের উপযুক্ত বয়স। কিন্তু প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্ট ধর্মমতে যে কোন বয়সেই পাপ স্বীকার করা যায়। অর্থাৎ পাপ স্বীকারে বয়সের কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাথলিক ধর্মমতে পোপ হচ্ছেন যীশুর প্রতিনিধি। যিনি যীশুর নামে মন্ডলী পরিচালনা করে থাকেন। পোপ একবার নির্বাচিত হলে আ-মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল থাকেন। পোপ হচ্ছেন বিশ্বের ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু। পোপের নিচের পরিষদ হচেছ Cardinal, কার্ডিনাল। কার্ডিনালের পরের পরিষদ হলো আর্চবিশপ। আর্চবিশপের পর বিশপ। আবার বিশপের পর ফাদার। প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ক্যাথলিক পোপের মত ধর্মগুরু নেই। অর্থাৎ তাদের ধর্মে পোপীয় প্রাধান্যের স্বীকৃতি নেই। প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানদের যে ধর্মগুরু থাকে তাকে আর্চ বিশপ বলা হয়ে থাকে।

ক্যাথলিক ধর্মে যীশু খ্রীষ্টের মাতা মরিয়মকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দিয়ে খ্রীষ্ট উপাসনার শেষে দূতের বন্দনায় প্রণাম মারীয়া অনুষ্ঠিত হয়, (যে স্বর্গীয় দূত কুমারী মরিয়মের নিকট তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের আগমনের শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন তারই বন্দনার নাম দূতের বন্দনা)। এই দূতের বন্দনায় প্রণাম মারীয়ায় যীশু খ্রীষ্টের মাতা মরিয়মের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয় যা প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্ট ধর্মে করা হয় না।[১২]

উল্লেখ্য, মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণেই এক ধর্মে যীশুর মাতা মরিয়মের জন্য প্রার্থনা করে প্রণাম মারীয়া অনুষ্ঠিত হয়। আর অন্য ধর্মে মানে প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্ট ধর্মে তা করা হয় না। এই বিভিন্ন মতাদর্শ প্রাচ্যের ক্যাথলিক মন্ডলী হতে বিচ্ছেদের কারণেই হয়েছে। এই বিচ্ছেদ এর দুটো কারণ রয়েছে। যেমনঃ-

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ- প্রথম প্রকার বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছিল প্রাচ্যে। এই বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়েছিল এফেসুস ও ক্যালসিডন্ মহা সভায় ব্যক্ত ধর্মতত্ত্বের সূত্রাবলীর বিবাদ নিয়ে এবং পরবর্তীকালে প্রাচ্য মহাধর্মপাল বা প্যার্ট্রিয়ার্কের শাসনাধীন এবং পোপের শাসনাধীন মান্ডলিক সম্পর্কের বিচ্যুতির ফলে।

দ্বিতীয়তঃ- দ্বিতীয় প্রকার বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছিল আরো চারশ বছর পরে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে। মধ্যযুগের শেষার্ধে অথবা তার পরবর্তী কালে পাশ্চাত্যে যে ভয়াবহ সংকট প্রকটভাবে দেখা দেয়, তার ফলে বিভিন্ন মন্ডলী ও সম্প্রদায় রোমের প্রৈরিতিক আসন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যে সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত বিচ্ছেদ গুলো সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে সাধারণতঃ ধর্ম সংস্কার আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান মিশনারীরা আবার বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যাইহোক, এই প্রোটেষ্টান্ট এবং ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের শাসন শৃংখলা ও বিশ্বাসের প্রকৃতি ও বিষয় নিয়ে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে তা উক্ত দুটো প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক মতভেদ সৃষ্টি করেছে।[১৩] অর্থাৎ এই দুটো সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক জীবন সাধনা, ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মতত্ত্ব ও উৎপত্তির মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপারে যথেষ্ট বর্ণনা দেয়া এক ভীষন কঠিন কাজ। তবু এ অধ্যায়টিতে সংক্ষিপ্ত আকারে তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা হয়েছে মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকাসমূহ

১। খ্রীষ্ট ধর্মীয় শব্দার্থ

ফাঃ দানিয়েল লৌয়ারী

পৃঃ ৬৩/ ক

২। মন্ডলীর আইন ধারা ৩৩১

৩। খ্রীষ্ট ধর্মীয় শব্দার্থ

ফাঃ দানিয়েল লৌয়ারী

পৃঃ ১৬৫/ প থেকে ১৬৬/ প

৪। খ্রীষ্ট ধর্মীয় শব্দার্থ

ফাঃ দানিয়েল লৌয়ারী

পৃঃ ১৬৫/প ১৬৬/প

৫। বাংলাদেশে খ্রীষ্ট মন্ডলীর ইতিহাস

প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত

পৃঃ ১৯

৬। খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর পালক সহচর

পঞ্চম সংস্করণ

১৯৯৩

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

পৃঃ ২২-২৪

Dhaka University Institutional Repository

৭। ধর্ম বই

প্রতিবেশী প্রকাশনী

৬১/১ সুভাস বোস এভিনিও

লক্ষীবাজার,ঢাকা।

পৃঃ ১১

৮। ঐ

পৃঃ ২৬-৩১

৯। দ্বিতীয় ভাটিকান মহা সভার দলিল সমূহ

The Documents of Vatican II

General Editior, Austin Flannery

op. Dominican publications

Dublin/ Ireland 1975, পৃঃ ১৭০

১০। ধর্ম বই

প্রতিবেশী প্রকাশণী

৬১/১ সুভাস বোস এভিনিও

লক্ষীবাজার ঢাকা

পৃঃ ৩৪

১১। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল সমূহ

General Editor

পৃঃ ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

১২। প্রোটেষ্টান্ট ফাদার টমাস মনিমোহন বৈদ্য ও ক্যাথলিক ফাদার বার্ণাড পালমার দেয়া তথ্য

১৩। Roman Catholicism
Boettner, Loraine
London, 1966.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাস ও ধর্ম জীবনঃ একটি পর্যালোচনা।

খ্রীষ্টান মিশনারীদের এদেশে আগমনের সময়কাল ছিল মুঘল শাসনামল। সে সময়ের অর্থাৎ ষোড়শ শতকের বাংলার সমাজ ধর্মীয় ভিত্তিতে দুভাগে বিভক্ত ছিল, যথা হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দু আইন অনুসারে হিন্দু সমাজ এবং মুসলিম আইন অনুসারে মুসলিম সমাজ শাসিত হত। সমাজে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

সামাজিক মর্যাদা অনুসারে হিন্দু সমাজ কুলীন ও অকুলীন এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কুলীন হিন্দুগণ আবার ব্রাহ্মন, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল। অকুলীন সমাজ কুম্ভকার, কর্মকার, মুচি চাষা ও ছুতার প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল। অকুলীনদেরকে কুলীনগণ তুচ্ছ জ্ঞান করত। সমাজে অস্পৃশ্যতা বর্তমান ছিল এবং সে কারনেই হিন্দু সমাজ দুর্বল ও শতধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে যুগে হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সামাজিক বিধি অনুসারে বয়স্ক নারীর বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল এবং এই সকল নারীদের পিতা মাতা সমাজে নিন্দিত হতেন। বিয়ের ব্যাপারে নারীদের কোন রূপ মতামতের বা সম্মতির মূল্য ছিল না। অনেক সময় বিয়ে নারীদের রুচি বিরুদ্ধ হত। বিয়ে বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণত সাত থেকে দশ বছরের মধ্যেই বালিকাদের বিয়ে দেয়া হত। বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলে বিবেচিত হত। কুলীনদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সমাজে বিধবার কোন মর্যাদাই ছিল না। কোন অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতিকে

Dhaka University Institutional Repository

কুলক্ষন বলে মনে করা হতো। কাজেই বিধবা নারীর মর্ম যাতনার অন্ত ছিল না। সমাজের বা গৃহের এই যাতনা থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেক বিধবা আত্মঘাতিনী বা গৃহত্যাগিনী হত। হিন্দু সমাজে বালিকাদের পৈতৃক কিংবা স্বামীর সম্পত্তিতে কোন অধিকারই ছিলনা। ফলে তাদেরকে পিতা, স্বামী, ভাই কিংবা পুত্রের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হতে হত। হিন্দু নারীদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। মুঘল সম্রাটগণ এই নিষ্ঠুর অমানবিক রীতি তুলে দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তবে তাদের নির্দেশ ছিল যে, কোন বিধবাকেই তার সম্মতি ছাড়া সহমরনে বাধ্য করা যাবে না এবং বিধবার মতামত যাচাইয়ের সময় সরকারী কর্মচারীকে উপস্থিত থাকতে হবে। বিধবা নারীদের অলংকার পরা নিষিদ্ধ ছিল এবং তাদেরকে মাংস ও মাছ খাওয়া থেকেও বিরত রাখা হত। ইউরোপীয় গ্রন্থকারদের বিবরনী থেকেও সেই সময়ের বাংলাদেশের সতীদাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। স্ক্রাফটন (Scrafton) নামক জনৈক ইংরেজ লেখকের মতে সতীপ্রথা শুধু মাত্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । অপর ইউরোপীয় গ্রন্থকার ষ্টাভোরিনাস (Stavorenus) এর মতে এই প্রথা কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। পণ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল এবং পণ গ্রহিতা পিতা তার কচি মেয়েকে স্বামীর গৃহে পাঠিয়ে দিতে আইনত বাধ্য থাকতেন। অবিবাহিতা দশ বছরের অধিক কন্যার পিতাকে সামাজিক শাস্তি ভোগ করতে হত। বিয়েতে যৌতুকাদি দেবার প্রথা ছিল। কিন্তু কন্যার স্বামী পরিত্যাগে কোন ক্ষমতাই ছিল না। ভেরেলষ্টের মতে, মেয়েরা স্বামীদের ইচ্ছার দাসী ছিল। স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করত। মোট কথা সে যুগে হিন্দু সমাজে নারীর কোন মর্যাদা ছিল না বললেই চলে।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙ্গালী হিন্দু পুরুষেরা ধুতি ও চাদর পরত। বিলাসী হিন্দু পুরুষগণ রূপা ও ভেলভেটের জুতা, কানে স্বর্ণালংকার ও পরনে তাতের বস্ত্র পরিধান করত। ধনীরা অঙ্গরাখা ও পাগড়ী পরত। ইজার কোমর বন্ধ, কাবাই প্রভৃতি ছিল দরবারের পোষাক । গরীবগণ কোমরে নেংটি জড়াত। সাধারণত মেয়েরা খালি গায়ে শাড়ি পরত। অবস্থাসম্পন্ন ঘরের মেয়েরা বিভিন্ন রংয়ের রেশমের শাড়ি ব্যবহার করত। অলংকার ছিল মহিলাদের খুবই প্রিয় এবং তারা সাজ সজ্জা করতে পছন্দ করত। নথ, সিথি, হার, কানবালা, অনন্ত , চক্রবলী খাড়ু, বাজু শাঁখা প্রভৃতি অলংকার ধনী গৃহের মহিলারা ব্যবহার করত। এ সব অলংকার সোনা রুপা ও হাতির দাঁত দ্বারা তৈরী হত এবং তা মনিমানিক্য খচিঁত থাকত। সধবারা শাখা সিদুঁর ও কাজল পরত।

বিলাসী মুসলমান পুরুষেরা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত লম্বা জোব্বা পরত। হাতে মনি মানিকখচিত অনেকগুলি আংটি এবং মাথায় সূক্ষ্ম তুলার কাপড়রে টুপি পরত। তারা খুব বিলাসী। মেয়ে পুরুষ উভয়েই উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল। প্রত্যেকের ৩/ ৪ বা ততোধিক স্ত্রী থাকত। স্ত্রীরা পর্দানশীন হত।

উল্লেখ্য, মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। পিতা, স্বামী বা ভাইয়ের সম্পত্তিতে তারা অংশীদার হতে পারত। স্বামী পছন্দ এবং অপছন্দের ব্যাপারে ও তাদের মতামত গ্রহণ করা হত। তাদেরকে স্বামী পরিত্যাগের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল এবং মোহরের যাবতীয় অর্থ তারা স্বামীর নিকট থেকে আদায় করতে পারত। পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করতে পারত

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সকল স্ত্রীর প্রতি সমব্যবহার করতে হত। নতুবা ক্ষতিগ্রস্থ স্ত্রী কাজির নিকটে বিচার প্রার্থীনী হতে পারত। বিধবা বিবাহ মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। তবে কেউ যদি দ্বিতীয় বিয়েতে অস্বীকৃতি জানাত তার উপর সামাজিক কোন জুলুম করাত হতইনা বরং অন্যরা তার প্রতি সহানুভুতিশীল থাকত। অনেক সময় অল্প বয়সেই ছেলে/ মেয়েদের বিয়ের সমন্ধ স্থির হত। কিন্তু বয়প্রাপ্ত হবার পূর্বে বিয়ে হত না। বর ঘোড়ার চড়ে শোভা যাত্রা করে কনের বাড়িতে যেত সেখানে কাজির সামনে মোল্লা বিয়ে দিতেন। ধনীর বাড়ীতে ভোজ নৃত্যগীতাদি একাধিক দিন চলত। বিয়ে সম্বন্ধে হিন্দুর অনেক লৌকিক আচার অনুষ্ঠান মুসলমান সমাজেও প্রচলিত ছিল।

ইসলামি বিধি অনুসারে সকল মুসলমান সমান। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে এদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে আশরাফ ও আতরাফ (কুলীন ও অকুলীন) এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এছাড়া শেখ, সৈয়দ, মোঘল ও পাঠান প্রভৃতি স্থানীয় শ্রেণী বিন্যাস মুসলমান সমাজকে অনেকাংশে দুর্বল করে দেয়। এই সব শ্রেণীর মধ্যে আন্ত শ্রেণীয় বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া মুসলমান সমাজ পেশাগত ভিত্তিতে তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। সুবাদার, নবাব, সেনাপতি ও আমীরগণ পড়তেন প্রথম বিভাগে, মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ ছিলেন দ্বিতীয় বিভাগে। কৃষক ও তাতী এই শ্রেণীর অন্যান্য লোকজন পড়তেন তৃতীয় বিভাগে। তবে মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয়া হত এবং গুনী লোকদের সমাদর নবাব ও বাদশাহী দরবারে ও স্বীকৃত হত। দাস প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। মুসলমান নবাব, সুবাদার ও আমীর ওমরাগণ

Dhaka University Institutional Repository

অপত্য স্নেহে দাসদাসীকে পালন করতেন। হিন্দু সমাজে নারীর মর্যাদা না থাকলেও মুসলিম সুবাদার ও নবাবগণ নারীর উচ্চ মর্যাদা দিতেন।[১]

ধর্মজীবনঃ- সেই সময়ে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জাতিগত শ্রেনীভেদ ব্যতিরেকে হিন্দু সমাজে কতগুলো সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। দেবদেবীর আরধনাকে কেন্দ্র করে এই সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব, যেমন শৈব ও শক্তি ইত্যাদি। শিব ছিল শৈব ধর্মের মূল উৎস। এই ধর্মীয় মতবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যোগ সাধনা। আর শক্তি ধর্মের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শক্তির উপাসনা বা তান্ত্রিকতা ও নরবলী। হিন্দু সমাজে মনসা, চন্ডী, শীতলা ষষ্ঠী ও অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনা শুরু হয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে। দূর্গাপূজা বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক জীবনে সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতকে এই দূর্গাপূজা হিন্দুদের একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। এছাড়া গণেশ, সরস্বতী ও লক্ষী পূজাও বাঙ্গালী হিন্দুদের বাৎসরিক ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়। এই সময় হিন্দু জাতির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও যথেষ্ঠ ছিল। ষোড়শ শতকে নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণবদের মধ্যে যৌনাচার ও মদ্যপানের প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য উচ্চশ্রেণীর বৈষ্ণবরা এরূপ অনাচার থেকে বিরত ছিল। নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবদের নিয়ে বৈরাগীরা একটি শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি করেছিল। এরা উন্নত আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থাকত এবং তাদের শিষ্যদেরকে মধ্যপান থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিত। তাদেরকে নিয়ে বৈরাগীরা উপাসনা সঙ্গীত ও নাম কীর্তনের অনুষ্ঠান করত। হিন্দু সমাজে বৈরাগীদের প্রচেষ্টায় বৈষ্ণবরা বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এ সময়ে হিন্দু সমাজে প্রকটভাবে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছিল। এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধ ও বিদ্বেষ ছিল অতি পরিচিত ঘটনা।[২]

ষোড়শ শতকে মুসলমান সমাজে শিয়া ও সৈয়দদের এক বিশেষ অবস্থান লক্ষণীয়। নবাবগণ সৈয়দ ও শিয়াদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ যুগে বাংলায় বহু শিয়ার আগমন ঘটে। এরা সাধারণত শহরাঞ্চলে বাস করতেন।[৩] গ্রামে এদের প্রভাব কম দেখা যায়। যাইহোক, মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব যেমন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ভাবগাম্বীর্য ও জাঁকজমকের সাথে উদযাপিত হত।

বহু শতাব্দী ধরে একত্রে বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম পরস্পরের সংস্পর্শে আসার ফলে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে উদারনৈতিক ধর্ম আন্দোলনের ফলে উভয় ধর্ম পরস্পরকে প্রভাবিত করে। সামাজিক ক্ষেত্রে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল। বাংলার নবাবগণ হিন্দুদের হোলি উৎসবে যোগ দিতেন। হিন্দু দেব দেবী ও হিন্দু মন্দিরে মুসলমানদের শ্রদ্ধাঞ্জলীর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। অপরপক্ষে মুসলমান পিরদের দরগায় হিন্দুদেরও শ্রদ্ধাঞ্জালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের বিনিময় থেকে বাংলাদেশে সত্যপির পূজার উদ্ভব হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এই সত্যপিরের পূজা ও উপাসনা করত। আর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি থাকার ফলে বাংলার সামাজিক জীবনে শান্তি বিরাজিত ছিল।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকাসমূহ

১। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা
কে,এম, রাইছউদ্দিন খান
নবম সংস্করণ,১৯৯৯
পৃঃ-৫২৯,৫৩২

২। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা
কে, এম, রাইছউদ্দিন খান
নবম সংস্করণ,১৯৯৯
পৃঃ-৫৩০-৫৩১

৩। বাংলাদেশের ইতিহাস
১৭০৪-১৯৭১
(সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস)
৩য় খন্ড
সম্পাদকঃ সিরাজুল ইসলাম
পৃঃ-৫৩

৪। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা
কে, এম, রাইছউদ্দিন খান
পৃঃ-৫৩৫-৫৩৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়া বিশেষতঃ বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের আগমনের পটভূমি বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা।

সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের মতে "আমার সোনার বাংলা" এই সোনার বাংলাই ছিল ভারতবর্ষে তথা দক্ষিণ এশিয়ার সবচয়ে উর্বর ভূমি। কেননা গঙ্গা (পদ্মা) নদীর সংস্পর্শে পলি মাটি তার উপরে প্রসূত হয়। ফলে এককালে বঙ্গ দেশকে ভারতের স্বর্গ বলে আখ্যায়িত করা হতো। মধ্যযুগে ঐতিহ্যবাহী মসলিন কাপড় ও বিভিন্ন প্রকার মসলা উৎপাদনের জন্য পূর্ব বাংলা বিখ্যাত ছিল । আর এই ঐশ্বচর্য্যের সূত্র ধরেই এদেশে বিভিন্ন জাতি যেমন মুঘল, পাঠান, ফরাসি ও ইংরেজদের আগমন ঘটেছিল বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানের মধ্যে দিয়ে । তেমনি ভাবে ঐশ্চর্য্যের সন্ধানেই ব্যবসা বাণিজ্যের উপলক্ষে এদেশে পর্তুগীজদের আগমন হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ধর্মীয় দিক হতে মুসলমানগণ আমাদের দেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ ও শতকরা ৮৫ ভাগ। তার পরেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের স্থান শতকরা ১৩ ভাগ। বৌদ্ধ ধম্বাবলম্বীদের সংখ্যা শতকরা দুই ভাগের মত এবং খ্রীষ্টানদের সংখ্যা শতকরা অর্ধেকেরও কম। যুগ যুগ ধরে যে সকল ধর্ম ও সভ্যতা বাংলাদেশে প্রবেশ ও প্রসার লাভ করেছে খ্রীষ্ট ধর্ম এসেছে তাদের সবার শেষে।

Dhaka University Institutional Repository

রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী বাংলাদেশের প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় মন্ডলী। পর্তুগীজ নাবিক বণিক ও পাদ্রীরা ষোড়শ শতকে এর গোড়াপত্তন করেন।

মুঘল আমলঃ- মুঘল আমলে এদেশে খ্রীষ্ট ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে থাকে। উল্লেখ্য, পর্তুগীজ বসতি স্থাপনকারী ও ব্যবসায়ীদের সাথে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ভারতে আসেন এবং ১৫৭৭ সালে মুঘল সম্রাট আকবর পর্তুগীজদের বঙ্গে স্থায়ী বসতি স্থাপন ও গীর্জা নির্মাণের অনুমতি দেন। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বর্তমান সাতক্ষীরার নিকটবর্তী চন্ডিকা বা ঈশ্বরীপুর নামক স্থানে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্যাথলিক গীর্জা নির্মিত হয় এবং দ্বিতীয় গীর্জাটি ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে নির্মাণ করা হয়। পর্তুগীজ মিশনারীরা ১৬১২ সালে ঢাকায় প্রথম খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করেন এবং ঢাকার নারিন্দায় প্রথম গীর্জা ঘর নির্মাণ করা হয়। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে ফাদার ফ্রান্সেসকো ফেরনান্দেস এবং ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় বেরনার্দো দ্য জেসুস্ খ্রীষ্ট ধর্মের জন্য মৃত্যু বরণ করেন।

ভূষণার হিন্দু রাজকুমার ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে একজন পর্তুগীজ মিশনারীর হাতে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আন্তইন ডি রোজারিত্ত নাম ধারণ করেন এবং ঢাকা জেলার ত্রিশ হাজার লোককে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার অর্ন্তগত তেজগাঁও নামক স্থানে একটি এবং ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বিশ মাইল উত্তর পূর্বে নাগরীতে আরেকটি যাজক বসতিসহ খ্রীষ্টান কেন্দ্র অর্থাৎ ধর্মপল্লী স্থাপিত হয়। ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় যে, অন্যান্য ধর্মের মত খ্রীষ্ট ধর্মও ব্যবসা বাণিজ্যিক দলের সঙ্গে এদেশে

Dhaka University Institutional Repository

এসেছিল। আর তাঁরা যখন এদেশে এসেছিল তখন সেই যুগ ছিল মুঘল যুগ বা আমল। মুঘল আমলে খ্রীষ্ট বাণী প্রচারিত হয় এবং খ্রীষ্টে দীক্ষিত স্থানীয় ভক্তদের সহযোগীতায় বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারিত হয়।

বৃটিশ আমলঃ- ভারতে বৃটিশদের রাজত্ব যদিও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সূত্রপাত হয় তথাপি সেই নতুন রাজত্বের কোন প্রভাব প্রথম দিকে অনুভব না করে পর্তুগীজ মিশনারীগণ খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের কাজ পূর্বের মত চালিয়ে যেতে থাকেন। ফলে ১৭৬৩ সালে বরিশাল জেলার পাদ্রিশিবপুরে একটি এবং ১৭৭৭ সালে ঢাকার বিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে হাসনাবাদ গ্রামে আরেকটি ধর্ম পল্লী স্থাপিত হয়।

বাংলাদেশের ক্যাথলিক সমাজ প্রথমে পর্তুগাল এবং পরে রোমে অবস্থিত পোপ মহোদয়ের পৃষ্টপোষকতায় সমর্থনে ও সাহায্যে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে আগত ধর্মপ্রান সন্নাসব্রতী ও যাজকদের সহযোগিতায় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উনবিংশ ও বিংশ শতকে তা বিস্তার লাভ করতে থাকে।

যদিও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায়গুলোর আর্বিভাব পূর্বেই হয়েছিল তথাপি বঙ্গে তাদের আগমন হয় মাত্র বৃটিশ আমলে। ১৭৯৩ সালে ইংল্যান্ডের ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটির সদস্য রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরী পশ্চিম বঙ্গে শ্রীরামপুরে পৌঁছে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। যার ফলে পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ড , স্কটল্যান্ড, জার্মানী, স্কান্ডেনিভিয়া, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা থেকে বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করে এবং সম্প্রদায়গুলো প্রতিষ্ঠিত করে। যে প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায়গুলো আগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল নাগাদ এ দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মতৎপর ছিল সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ

১। ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন

২। অস্টেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট মিশন

৩। অক্সফোর্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন

৪। নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন

৫। ইংলিশ প্রেসবিটারীয়ান মিশন

৬। ওয়েলশ্ প্রেসবিটারীয়ান মিশন

৭। লুথারেন মিশন

৮। চার্চেজ অব গড মিশন

৯। এ্যাংলিকান চার্চ

১০। সেন্ট এন্ড্রুজ মিশন/ হালুয়াঘাট

১১। এ্যাসেমব্লীজ অব গড মিশন

১২। খ্রীষ্ট যীশুতে এক মন্ডলী বা সহভাগিতার দল

ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম এসেছে মুঘল আমলে কিন্তু তার সুপ্রতিষ্ঠা হয়েছে বৃটিশ আমলে। তবে বৃটিশ রাজত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রসারণে সহায়তা করেনি। খ্রীষ্টান মিশনারীরাই খ্রীষ্টের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করেছেন এবং তাঁদের দ্বারাই ধর্ম পল্লী যাজক কর্তৃক পরিচালিত

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্টান এলাকা, ধর্মপ্রদেশ (ধর্মপাল বা বিশপ কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি ধর্ম পল্লীর সমন্বিত এলাকা) , ধর্ম কেন্দ্র ও অনেক সেবা প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১]

পাকিস্তান আমলঃ- পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হবার সময় দেশে বিরাজ করছিল এক অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ হতে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রদেশে পরিণত হবার ফলে এদেশের খ্রীষ্টীয় মন্ডলী এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায় বাংলাদেশের খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর অন্যতম মন্ডলী। বৃটিশ আমলে এই সম্প্রদায়গুলোর সকল কর্মতৎপরতার মূল কেন্দ্র ছিল ভারতের কলিকাতা। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অর্ন্তভূক্ত হলে এদেশের অধিকাংশ খ্রীষ্টান তাদের নিজ নিজ সংগঠনের মুল কেন্দ্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

যে সকল খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠান যথা গারো ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনী, পূর্ব বঙ্গ ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনী, চার্চেজ অব গড মিশন ইত্যাদি কেবলমাত্র বাংলাদেশের কয়েকটি বিশেষ এলাকায় কাজ করত সেই সকল প্রতিষ্ঠান ও নানা ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার কলিকাতা ও শ্রীরামপুরের উপর নির্ভরশীল ছিল। ভারত বিভাগের ফলে এই সকল প্রতিষ্ঠানও নানা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়।[২]

পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সৃষ্টির সাথে সাথে তাই বাংলাদেশের খ্রীষ্টীয় মন্ডলী সমূহ কে নতুন ভাবে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই কাজটি রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী সবার আগে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং

Dhaka University Institutional Repository

এরই ফলে সম্ভবত পাকিস্তানী আমলে তারা অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হলে পরবর্তীতে অন্যান্য খ্রীষ্টান মিশনারীগণ এদেশে তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। আর তাদের উদ্যোগেই ও প্রচেষ্টার ফলে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় বেশ সংখ্যক সেবা প্রতিষ্ঠান এবং জাতি ধর্ম শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে প্রসারিত হয় নানা প্রয়োজনীয় সেবা কাজ। তবে বিভিন্ন মিশনারীদের এরূপ প্রসারণের পশ্চাতে ছিল এদেশে পর্তুগীজ মিশনারীদের আগমনের ক্ষেত্রে উদ্ভব আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি সমূহ। এ প্রসঙ্গের উপর আলোকপাত করা হলো।

আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতিসমূহঃ-

(ক) মুঘল শাসনামলে বর্হিবিশ্বের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে সময়ে নৌপথে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়ায় শ্রেষ্ট অবদান রেখেছিল পর্তুগীজগণ। নৌ বাণিজ্যে পর্তুগালের সঙ্গে বাংলার প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় ষোল শতকের শেষ ভাগে। তবে বাংলায় ব্যাপক বাণিজ্য শুরু করেছিল প্রথম ওলন্দাজরা। বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে ওলন্দাজদের পরে শরিক হয় ফরাসী, ইংরেজ ওয়েন্ডার (বেলজিয়াম), পর্তুগাল ও অন্যান্য ইউরোপীয় নৌজাতি। মুঘল সরকার এদের সবাইকে স্বাগত জানিয়েছিল এদেশে বাণিজ্য করার জন্য কারণ এর ফলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করে। আর যেহেতু বাংলাদেশ আমদানির চেয়ে রপ্তানি করতো অনেক বেশি, সেহেতু বাংলার পক্ষে বাণিজ্য উদ্ধৃত্ত ছিল অনেক বেশি এবং সে উদ্ধৃত্ত রপ্তানির ঘাটতি পূরণের জন্যে বিদেশীরা আমদানি করতো বিপুল পরিমাণ সোনা রুপা। নতুন বিশ্বে অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম গোলার্ধে যে সোনা রুপা আহরিত হয়েছিল এর একটি বড় অংশ ইউরোপ হয়ে বাংলায় এসে জমা হতো। প্রতি বছর শত শত জাহাজ নোঙ্গর করত কলিকাতা বন্দরে। সে সব জাহাজের ব্যবসায়ীগণ বিশ্ব বাজারে বিপনণের জন্য ক্রয় করতো বাংলার রকমারী পণ্যসামগ্রী আর রপ্তানির বিনিময়ে মূঘল সরকার লাভ করতো বিপুল পরিমাণ সোনা রুপা।[৩]

উল্লেখ্য, ভারতীয় তাঁত বস্ত্র সে সময় রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষে ছিল। এই তাঁত বস্ত্র কেনার জন্য ওলন্দাজরা সঙ্গে নিয়ে আসতো রৌপ্য। ঐ রৌপ্যের পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং ঘাটতি পুরণের জন্য রৌপ্য সংগ্রহ করা হতো দূর প্রাচ্যে বাণিজ্যের মাধ্যমে। ওলন্দাজরা চীনে ক্রয় করতো রেশম ও অন্যান্য দ্রব্যাদী যা তারা বিক্রয় করতো জাভায় বিক্রয়লব্ধ জাভাই রৌপ্য এবং ইন্দোনেশীয় গোল মরিচের বিনিময়ে তারা তাইওয়ানে লাভ করতো স্বর্ণ। পাশ্চাত্য থেকে আনা রৌপ্য এবং দূর প্রাচ্য বাণিজ্যে লব্ধ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির বিনিময়ে কেনা হত ভারতীয় তাত বস্ত্র। ঐ তাঁতবস্ত্রের কিছু অংশ বিনিময় হতো ইন্দোনেশীয় গোল মরিচ এবং অন্যান্য মসলার সঙ্গে আর বাকি অংশ রপ্তানি হত বিভিন্ন এশীয় দেশে ও ইউরোপে । দূর প্রাচ্য থেকে প্রাপ্ত গোল মরিচ ও মসলাদির বেশির ভাগ রপ্তানি হতো ইউরোপে এবং বাকি অংশ বিপনণ করা হতো ভারত, পারস্য, তাইওয়ান ও জাপানে। গোলমরিচ ও অন্যান্য মসলা, চিনি ও ভারতীয় তাঁত বস্ত্রের বিনিময়ে পারস্য ও চীন থেকে সংগৃহীত হতো কাঁচা রেশম এবং রপ্তানি হতো ইউরোপে । মন্তব্য নিষপ্রয়োজন যে, এই বহু জাতিক বাণিজ্য দেশে সৃষ্টি করেছিল নতুন

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক। যে সম্পর্ক তৈরী করেছিল একটি বহুজাতিক ও বহুমুখী বাজার। এ বাজার ছিল একদিকে আন্তঃএশীয় ও অপরদিকে এশীয় বনাম ইউরোপীয়।[৪]

এশীয় দেশগুলোর পাশা পাশি ইউরোপীয় দেশসমূহ ভারতের সাথে সুন্দর একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলার মাধ্যমে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের বাজার সৃষ্টি করেছিল। যে বাজার ব্যবস্থায় এদেশের পণ্য সামগ্রী ক্রয় করার জন্য অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে পর্তুগালের একটা ভুমিকা ছিল।

(খ) ভারত ও ইউরোপের সাথে পর্তুগালের বাণিজ্যিক বিনিময় ও আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের ফলে এ দেশে পর্তুগীজদের আগমনের পথকে সুগম করে তুলেছিল। উল্লেখ্য, মধ্যযুগে ভেনিশ শহর ভারতের সাথে আমদানি ও রফতানি করত এবং আরবীয় দেশগুলো এই কাজে মধ্যস্থতা করত। তখনকার পঞ্চদশ শতকে পর্তুগাল খুব শক্তিশালী দেশ হিসেবে খ্যাতী অর্জন করেছিল এবং সুযোগ খুজছিল কিভাবে আরবীয় বণিকদের ছাড়া ভারতীয় বণিকদের সাথে সরাসরি বাণিজ্য করা যায় ফলে পর্তুগীজ ও স্পেনিয়ডরা জলপথ খুজতে থাকে। বারথোলমেউ দিয়াস (ডায়েস) জাহাজে করে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তমাশাঅন্তরীপ পেরিয়ে ১৪৮৫ সালে প্রথম জলপথ আবিস্কার করার সাথে সাথে ইতিহাসের নতুন পাতা খুলে যায়। যার ফলে ভাস্কো দা গামা সুদূর মোজাম্বিক থেকে দুজন খ্রীষ্টান পুরোহিত কে সাথে করে ভারতের কালিকট বন্দরে এসেছিলেন।[৫]

উল্লেখ্য, ভাস্কো দা গামাকে যখন কয়েকবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কিসের জন্য তিনি ভারতবর্ষ এসেছেন, তিনি সব সময় উত্তর দিতেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্টানদের ও মসলার সন্ধান করতে ভারতবর্ষে এসেছেন। অবশ্যই ভাস্কো দা গামার মতো সব পর্তুগীজ নেতা ও নাবিকদের এই রকম সুন্দর উদ্দেশ্য ছিল না বললেই ভুল হবে না।

বাস্তবিক কোচীন শহরে পর্তুগীজদের প্রথম দূর্গ ও গীর্জা নির্মিত হয়েছিল।১৫০০ সালের পর থেকে ধর্মযাজক ওব্রাদারগণ ধর্ম প্রচারের কাজে ভারতবর্ষে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষত তৎকালীন পূর্ব বঙ্গ ও অন্যান্য দেশে থাকতে আরম্ভ করেন। শুরু হল ধর্ম প্রচার অভিযান।

১৫০২ সালে কুড়িটি জাহাজ নিয়ে ভাস্কো দা গামা দ্বিতীয়বার ভারতে এসেছিলেন। তিনি চারজন পুরোহিতকে নিয়ে এসেছিলেন। ১৫০৯ সনে আল বুকেরকে পাঁচজন পুরোহিত কে সাথে করে ভারতে এসেছিলেন। বাণিজ্য ও এশিয়ায় প্রশাসনের কেন্দ্র স্বরুপ গোয়া বন্দরটি আল ফন্সো আল বুকেরকে ১৫১০ সালে দখল করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে গোয়াই ভারতের খ্রীষ্ট মন্ডলীর কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। যার ফলে ১৫৩৪ সালে পোপ তৃতীয় পল ভারতবর্ষে গোয়া ধর্মপ্রদেশ হিসেবে ঘোষনা করেছিলেন এবং পর্তুগাল রাজার সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল যে, ধর্ম বিষয় এবং বিশেষ ভাবে ধর্মপালদের নিয়োগের ব্যাপারে পর্তুগাল রাজার অধিকার ও সুবিধা থাকবে। ১৫৪২ সালে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠতম প্রেরিৎকর্মী সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার গোয়ায় এসেছিলেন। তিনি জাপান ও চীন পর্যন্ত খ্রীষ্ট বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় খ্রীষ্ট বাণী প্রচার অভিযান প্রবল হয়ে উঠেছিল ১৫৫৭ সালে গোয়া মহা ধর্ম প্রদেশে উত্তীর্ন হয়েছিল। গোয়া কেন্দ্র থেকে সমগ্র দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় খ্রীষ্টবাণী প্রচার অভিযান চলছিল। পরবর্তীকালে মাইলাপুর

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মপ্রদেশ হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। বঙ্গ ও চট্টগ্রাম মাইলাপুর ধর্মপ্রদেশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৬]

(গ) ষোড়শ শতকে আরবীয় দেশসমূহ যথা মিশর, পারস্য, বর্তমান ইরান পর্তুগালের সাথে ভারতের মধ্যে বানিজ্যিক ক্ষমতা লাভের জন্য দ্বন্ধ সৃষ্টি করে আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। এই দ্বন্ধে পারস্য ও মিশর পর্তুগালকে পরাজিত করলে ও ১৫০৯ সালে ফ্রান্সিসকো দে আলমেদার নেতৃত্বে পুর্তুগীজ নৌবাহিনী ভারতবর্ষের সমস্ত বন্দরের উপর দিয়ে হরমুজ প্রণালী দিয়ে পারস্য পর্যন্ত কর্তৃত্ব চালিয়ে সর্বত্রই জয়ী হয়ে উঠেছিল। যার ফলে সেদিন থেকে চীন দেশ হতে ইউরোপ ও আমেরিকা পর্যন্ত পর্তুগাল অবাধে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৫১০ সালে পর্তুগাল ভারতের কিছু কিছু এলাকা দখল করে নিজস্ব বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্বরুপ তা স্থাপন করেছিল।[৭]

এভাবে বাণিজ্যিক ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে পর্তুগাল পঞ্চদশ শতকের বিশ্বে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

(ঘ) ১৬শ শতাব্দীতে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার ও বিস্তার কার্যে অগ্রনী ভুমিকা গ্রহণের স্বীকৃতি স্বরূপ পোপ মহোদয় পর্তুগালের রাজাদের বিশেষ অধিকার দিয়েছিলেন।[৮] যার ফলে বিভিন্ন দেশে মিশনারী পাঠাবার একচেটিয়া অধিকার ছিল পর্তুগীজ সরকারের এবং এই ক্ষমতা বলেই পর্তুগীজ সরকার ভারত ও তৎকালীন পূর্ব বঙ্গে মিশনারী প্রেরণ করত ।তখনকার আন্তর্জাতিক

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতিই এমনি করে পর্তুগালকে বিশ্বে খ্রীষ্ট ধর্ম পচারের ক্ষেত্রে সহজ উপায় করে দিয়েছিল।

(ঙ) সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে বর্হিবিশ্বে বৃটেনের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় ষোল আনাই। উল্লেখ্য ইংল্যান্ড বা বৃটেন ইউরোপের একটি ছোট্ট দেশ। এ দেশটি বুদ্ধিমত্তা ও কর্তৃত্বে সারা বিশ্বে প্রভাব সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রদাশ করেছিল। সপ্তদশ শতকে ভারতের সাথে বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় ইংল্যান্ডের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রচুর অর্থশালী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠার কারণে একসময় এদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে বিভিন্ন দেশ হতে প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ১৭৫৭ সাল হতে ১৯০৫ এবং তারপরে ১৯৪৭ সাল নাগাদ এদেশে আগমন করে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষত তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন জেলায় কর্মতৎপর থেকে এক নতুন ইতিহাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

আঞ্চলিক পরিস্থিতি সমূহঃ-

(ক) ষোড়শ শতকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আবর্তে উদ্ভাবিত আঞ্চলিক পরিস্থিতি সমূহের মধ্যে দিয়ে পর্তুগীজ মিশনারীগণ এদেশে প্রবেশ করেছিল। উল্লেখ্য, ১৫১৭ সালে তারা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হন।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ তখন গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌড় সরকারের চোখে পর্তুগীজরা ছিলেন অবাঞ্চিত আগন্তুক, কিন্তু ১৫৩৭ সালে বিহারের শের শাহ্ দ্বারা গৌড়ের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়লে গৌড়ের সুলতান মাহমুদ শাহ্ পর্তুগীজদের নিকট হতে সামরিক সাহায্য লাভের আশায় তাঁদের চট্টগ্রাম ও পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার সাতগাঁওতে বাণিজ্যঘাটি স্থাপনের অনুমতি দান করেন।[১০] অতিঅল্প কালের মধ্যে চট্টগ্রাম ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে পর্তুগীজদের সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রে পরিণত হল।[১১] যার ফলে পর্তুগীজরা ধীরে ধীরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পায়। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বার ভূইয়াঁদের অভ্যুদ্বয়ের ফলে তখনকার বাংলাদেশ কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। চট্টগ্রামে আরাকানীদের আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বাংলাদেশের এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পর্তুগীজরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাণিজ্য বিস্তার করার সুযোগ লাভ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাকলা (বরিশাল), চান্দিকন (যশোর-খুলনা) এবং খুলনার টপগাঁওতে তাদের বাণিজ্য ঘাটি স্থাপন করে।[১২]

এদেশের রাজনীতির সাথে ও তারা এই সময় হতে জড়িয়ে পড়তে থাকে। বার ভূঁইয়াদের মধ্যে বরিশালের পরমানন্দ রায়, যশোরের প্রতাপাদিত্য ও ঢাকার কেদার রায়, তাঁদের নিজ নিজ নৌবাহিনীতে পর্তুগীজদের চাকুরী প্রদান করেন। চট্টগ্রামের আরাকানীদের সাথে পর্তুগীজদের মিত্রতা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের পর্তুগীজরা এদেশে হার্মাদ বা জলদস্যু হিসেবে যে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল তার মুলে ছিল এই মিত্রতা। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত দিয়াঙ্গা, বাকলা, চান্দিকন ও শ্রীপুরে খ্রীষ্টীয় সমাজের অস্তিত্বের প্রমাণ ইতিহাস আছে।

(খ) ১৫৭৬ সালে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে চট্টগ্রাম ও কয়েকটি দুর্গম এলাকা ব্যতীত সমস্ত বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়। এর দুটি কারণ ছিল যথা।

প্রথমতঃ মুঘল আমলে জেসুইট মিশনারীরা এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপ ও ইউরোপের বাহিরে জেসুইট মিশনারীরাই ক্যাথলিক মন্ডলীর গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। এদেশে যে সকল পর্তুগীজ ব্যবসা উপলক্ষে অথবা ভাগ্য অন্বেষণে এসেছিল তারা নিজেরাই খ্রীষ্টীয় আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন না করলেও অন্য ধর্মের লোকদের খ্রীষ্ট ধর্মান্তরিত করাকে অতি পূণ্যের কাজ বলে মনে করতো এই শ্রেণীর পর্তুগীজদের দ্বারা এদেশে খ্রীষ্টীয় সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হলেও জেসুইট মিশনারীরাই বাংলাদেশে প্রথম খ্রীষ্টীয় উপাসনাগৃহ অনাথ আশ্রম, স্কুল প্রভৃতি স্থাপনের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সু-সমাচার প্রচার করতে আরম্ভ করেছিল। বাংলা ভাষায় খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের সূত্রপাত তারাই করেছিলেন। জেসুইটদের পরে পিমে ও রোমান ক্যাথলিকগণ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ- মুঘল সম্রাট আকবর ও তার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর ধর্মীয় ব্যাপারে খুব উদার ছিলেন। তাদের উভয়ের সাথে জেসুইট মিশনারীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।[১৪] সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর জেসুইট মিশানারীদের এদেশে বিনা বাধায় খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন। অবশ্য জেসুইটদের প্রতি এই উদারতার পশ্চাতে যে মুঘল সম্রাটদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, তা নয়। পর্তুগীজদের সামরিক সাহায্য লাভে মুঘলগণ সব সময়েই সচেষ্ট ছিলেন। ১৬৬৬ সালে পর্তুগীজদের সাহায্যেই ঢাকার মূগল শাসনকর্তা শায়েস্তা খান আরাকানীদের হাত হতে চট্টগ্রাম দখল করেছিলেন। সুতরাং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষে মুঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর এদেশে পুর্তগীজদের ধর্ম প্রচার ও বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন।[১৫]

পর্তুগীজদের লুঠতরাজ, শিশু অপহরন প্রভৃতি দশ্যু বৃত্তি বন্ধের লক্ষ্যে মুঘলগণ সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে ১৬৩২ সালে হুগলির পর্তুগীজ উপনিবেশ অবরোধ করলে পর্তুগীজরা তাদের বাধা দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। পর্তুগীজ সেনাবাহিনীতে ইউরোপীয় ছিল ৩০০ জন আর দেশীয় খ্রীষ্টান ছিল প্রায় ৭০০ জন। অপরপক্ষে মুঘল বাহিনীতে ছিল প্রায় দেড়লক্ষ সৈন্য। ফলে পর্তুগীজরা পরাজিত হল।[১৬] তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে নিহত হয়নি, তারা হয় পালিয়ে অথবা মুঘল সম্রাটের দাস হয়ে অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রান রক্ষা করেছিল।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

এই সুযোগের সময় বহু দেশীয় খ্রীষ্টান হুগলী ছেড়ে বাংলাদেশের নানা স্থানে বিশেষ ভাবে ঢাকা জেলায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এতে এদেশের খ্রীষ্টান জনসংখ্যা যথেষ্ঠ বৃদ্ধি লাভ করেছিল। বাংলাদেশের রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী সমূহের আর্চ বিশপ মাইকেল এম রোজারিওর পূর্ব পুরুষগণ এই সময়েই হুগলী হতে এদেশে আগমন করেন। [১৮]

যার ফলে এদেশের খ্রীষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রামে ও ঢাকা জেলায় মন্ডলীর জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছিল। সপ্তদশ শতকের গণবাস্তিস্ন এর জলন্ত দৃষ্টান্ত। ১৬২১ হতে ১৬২৪ সালের মধ্যে অগাষ্টিনীয় ফাদারগণ চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের ২৮০০০ ক্রীতদাসকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা দান করেন।

একজন জেসুইট পাদ্রী ১৬৭৭ সালে ঢাকা অঞ্চল পরিভ্রমন করেছিলেন তাঁর হিসাব অনুসারে এই অঞ্চলে তখন ২৫,০০০ হতে ৩০,০০০ খ্রীষ্টান ছিল।[১৯]

সুতরাং উক্ত জরিপ অনুযায়ী দেখা যায় যে, খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের সন্তোষজনক কার্যের পরিপ্রেক্ষিত খ্রীষ্টান জনসংখ্যার বৃদ্ধির ব্যপক হার যা সম্ভব হয়েছিল এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের আগমনের মাধ্যমে।

মুঘল শাসনামলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের যে সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় উপমহাদেশে বাণিজ্য করতো সে সকলের মধ্যে ইংল্যান্ডের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে প্রচুর অর্থশালী ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল বোম্বাই, মাদ্রাজ, ও কলিকাতা কোম্পানীর নিয়ন্ত্রনে বড় বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানীর সেনাবাহিনী বাংলা বিহার উড়িষ্যায় মুঘল নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করলে পূর্ব ভারতে ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রতিপ্রত্তি খুব বেড়ে যায়। ১৭৬৫ সালে দিল্লীর মুঘল বাদশাহের নিকট হতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। ১৭৯০ সালে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবী আমল সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয়ে গেলে ইংরেজ শাষন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজরা ছিল প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান ইংরেজ শাসন এদেশে প্রোটেষ্টান্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেছিল বিধায় অষ্টাদশ শতক পেরিয়ে উনবিংশ বিশেষ করে বিংশ শতকের ১৯০৫ হতে ১৯৪৭ সাল নাগাদ এদেশে বিভিন্ন খ্রীষ্টান মিশনারীগণ কর্মতৎপর থেকে এক নতুন অধ্যায় সূচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

সুতরাং উপরিক্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে পর্তুগাল থেকে পর্তুগীজ ও পরে অন্যান্য প্রোটেষ্টান্ট মিশনারীগণ এদেশের আগমন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে খ্রীষ্ট মন্ডলী গড়ে তুলেছিল । পর্তুগীজ মিশনারীরা ছিল এদেশে আগমনকারী সর্বপ্রথম খ্রীষ্টান মিশনারী। পর্তুগীজ নাবিক, বণিক, যোদ্ধা ও তাদের এই দেশীয় খ্রীষ্ট ধর্মান্তরিত ক্রীতদাস দাসীও উপপত্নীদের গর্ভজাত সন্তানদের দ্বারা বাংরাদেশের আদি খ্রীষ্টীয় সমাজ গঠিত হয়েছিল। পর্তুগীজ মিশনারীদের পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মিশনারীগণ এ দেশে এসে খ্রীষ্ট মন্ডলী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইতিহাসের ধারাকে নতুন ভাবে চিত্রিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকাসমূহ

১ দীপ্ত সাক্ষ, ১৬শ বর্ষ, ডিসেম্বর ১৯৯০ বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে খ্রীষ্টান সমাজের অবদান।
ফাঃ বার্ণাড পালমা
পৃঃ-১-২।

২। বাংলাদেশের খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
পৃঃ- ১৮৪

৩। বাংলাদেশের ইতিহাস
১৭০৪-১৯৭১
অর্থনৈতিক ইতিহাস
২য় খন্ড।
সম্পাদকঃ- সিরাজুল ইসলাম
পৃঃ২-৩।

৪। The Dutch East India company and the Economy of Bengal 1630-1720
p-19.

Dhaka University Institutional Repository

৫। নোয়াখালী খ্রীষ্ট মন্ডলীর ইতিহাস
১৫০০-১৯৫০
ফাঃ আরতুরো স্পেজিয়ালে, পিমে
পৃঃ ২৫, ২৬, ২৮

৬। ঐ
পৃঃ ২৬

৭। ঐ
পৃঃ ২৬।

৮। প্রতিবেশী ক্রোড়পত্র
বিশ্বাস বিস্তার , রবিবার ১৮৯৭৭
পৃঃ১৮।

৯। History of partugues in Bengal , 1919
Campos, J. J. A
p-27.

১০। History of Bengal , voll. 11
p-357

Dhaka University Institutional Repository

১১। Bangladesh Itihas samity Historical studies
Voll.111, 1978
pp-40-51

১২। Sarkar, p-359-363

১৩। History of chittagong , 1964
Ali, Syed Murtaza
p-33

১৪। Oxford History of India
1985
Smith , V.A
p-365

১৫। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
পৃঃ-৩।

১৬। ঐ
পৃঃ-১০

Dhaka University Institutional Repository

১৭। Smith, p-380

১৮। স্মরণিকা, ১৯৭৮, আর্চ বিশপ
মাইকেল রোজারীও
পৃঃ-১

১৯। Crucial Issues in Bangladesh, 1976
Me , Nee
p-105.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ থেকে ভারত বিভাগঃ রাজনৈতিক পটভূমিতে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের কর্ম কৌশল, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক মাত্রা।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের নাগপাশ থেকে এক অস্থির রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল ইংরেজ অনুগত মুসলিম চাকুরে শ্রেণী তৈরীর অভিপ্রায়ে। কেননা এই ঔপনিবেশিক শাসনামলে হিন্দু সমাজের অনুকরণে মুসলিম সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল যথা আশারাফ (উচ্চবর্ণ) ও আতরাফ (নিম্নবর্ণ) উচ্চ বর্ণের মতো আশরাফ সম্প্রদায় আচার ব্যবহারে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মতো ছিল। আর আতরাফের অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত শ্রেণীসমূহ, যেমন তাতী, ধুনারী, কলু, নাপিত এবং দর্জি। এদের সঙ্গে আরো ছিল হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণ থেকে উদ্ভুত ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা।[১]

অর্থাৎ এক বিরাট সংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমান ছিল আশরাফ শ্রেণী বর্হিভূত আতরাফ এবং এরা ছিল প্রধানত কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।[২] এই উদ্ভুত দুটি শ্রেণীর মধ্যে ছিলনা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান। যদিও ইতিমধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলস্বরূপ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের শাখায় গঠিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মুসলিম সমাজে তখন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরীর প্রয়াস নিয়ে ১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গের যাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই যাত্রা ছিল ভারতীয় হিন্দু মুসলমানদের সরাসরি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ, এই উদ্যোগের বহিঃপ্রকাশ হলো ১৯০৫ সালের বাংলাদেশকে বিভক্ত করে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে একদিকে এবং পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন। বঙ্গ ভঙ্গের ফলে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তার ঘটেছিল। সহিংস কার্যের বৃদ্ধি ঘটেছিল। সহিংস সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে (হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে) ১৯০৫ সালের পরে পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় খ্রীষ্টের বাণী প্রচার কিছু কালের জন্য স্থগিত থাকে। তবে ১৯০৫ সালে ঢাকা, যশোহর ও বগুড়া জেলায় যথাক্রমে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী এবং চার্চেজ অব গড মিশনের মিশনারীগণ সক্রিয় ছিল । অন্যান্য মিশনারীগণের মতো। খ্রীষ্ট ধর্মের অন্যতম তাত্ত্বিক নির্দেশনা হলো প্রেরণ কর্ম। প্রেরণ কর্মের মধ্যে দিয়েই মূলত খ্রীষ্ট বাণী দেশ হতে দেশান্তরে প্রচারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রেরণ কর্ম জগত ও ইতিহাসের বুকে ঐশ পরিকল্পনারই মূর্ত প্রকাশ , তার বাস্তবায়ন ভিন্ন অন্য কিছু নয় বা এর চেয়ে কম কিছু নয়, ইতিহাসের এই ধারায় প্রেরণ কর্মের মাধ্যমেই যীশু খ্রীষ্ট পষ্টতই পরিত্রানের ইতিহাসকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যান।[৩] আর তাত্ত্বিক নির্দেশনা নিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত চার্চেজ অব গড মিশনের মিস হার্সী এবং বাওয়ার্স সম্পতি ১৯০৫ সালে বগুড়া জেলার আগমনের পর পরই তারা প্রচুর সুসমাচার ও প্রচার পত্র বিক্রয় ও বিলি করেছিলেন। কেউ তাদের বাধা দেয়নি। ১৯০৫ সাল হতে ১৯১১ সালের মধ্যে বগুড়া জেলায় ২৫ হাজার খ্রীষ্টান গ্রন্থ বিতরন করা হয়েছিল।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

শুধু বগুড়া নয় ১৯০৫ সালে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের মিস টেইলর এবং মিসেস গিলবার্ট যশোহরে এসে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য একটি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল হোম স্থাপন করেছিলেন। সেই সময়ে যশোহর অঞ্চলে এই দুইজন মহিলা মিশনারী অতি জনপ্রিয় ছিলেন।[৫]

অন্যদিকে ১৯০৫ সালে তৎকালিন পূর্ব বাংলা বৃটিশ ভারতের একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হলে ঢাকা এর রাজধানী হয়েছিল। নতুন প্রদেশের নতুন রাজধানীতে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের তৎপরতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বছরেই লন্ডনের রিজেন্টস পার্ক চ্যাপেলের আর্থিক সাহায্যে সদর ঘাটে "রিজেন্টস পার্ক হল নির্মিত হয়।"

১৯০৭ এর দিকে রেভারেন্ড জে, এন, দত্ত ২৩ জন সাঁওতালকে অবগাহিত করলে দিনাজপুর ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীর ইতিহাসে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়েছিল। ১৯০৮ সালে রেভারেন্ড সামার্স দিনাজপুরের কার্যভার গ্রহণ করেন। সাঁওতালদের মধ্যে বিশেষভাবে কাজ করার জন্য রেভারেন্ড সামার্স সাঁওতালী ভাষা শিক্ষা করেন। সাঁওতালী ভাষা শিখে তিনি অনেক সাঁওতালকে খ্রীষ্ট ধর্মে দিক্ষীত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সামার্স লিখেছেন যে, একজন সাওঁতাল যুবক অবগাহিত হয়ে কোন একটি গ্রামে যাবার পূর্বে আমার নিকটে সু-সমাচার চাইলে আমি তাকে ১২০ টি সু-সমাচার দিলাম। দুমাস পরে সে আরও পুস্তকের জন্য আসল। কিছুদিন পরে জানতে পারলাম যে, তারই কার্য্যের ফলে এই গ্রামের লোকেরা ধর্ম তত্বান্বেষণ করতেছে।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার ফলে সাওতাঁলদের জীবন যাত্রার মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হলে তারা শিক্ষিত হয়ে উঠে। এ দিকে ১৯০৭ সালে রেভারেন্ড এলিসন ও তার সহকর্মীগণ গাইবান্ধা মহকুমায় সাঁওতালদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচার কাজ আরম্ভ করেন। কিছুকাল প্রচারের ফলে কোটাবাড়ী গ্রামে ৮টি সাওতাঁল পরিবার খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু গ্রামের অন্যান্য সাওতাঁলরা তাদের উপর এমন অত্যাচার শুরু করলে একমাত্র রসিক মুর্মূ ও তার পরিবার ছাড়া সকলেই পুনরায় সাওতাঁল সমাজে ফিরে গিয়েছিল।[৭]

১৯১২ সালের দিকে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ খ্রীষ্টের বাণী প্রচারে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে (১৯১৪-১৯১৮) সারা বিশ্বে যেমন অস্থিরতার এবং উদ্বিগ্নময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তখন তৎকালীন পূর্ব বঙ্গে খ্রীষ্টের রাজ্য বিস্তারেও একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তখনও এই পূর্ব বাংলার খ্রীষ্টীয় মন্ডলীগুলো সব ব্যাপারে বিদেশী মিশনসমূহের উপরে নির্ভরশীল ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে সকল খ্রীষ্টীয় মিশন অর্থাভাবে অথবা নতুন নতুন মিশনারী না আসাতে এদেশে মিশনারীদের কাজ কমিয়ে দেয় অথবা সাময়িক কালের জন্য বন্ধ রাখে। এর ফলস্বরূপ খ্রীষ্টীয় মন্ডলীগুলোর মধ্যে ও একটা স্থবিরতা দেখা দেয়। সম্ভবতঃ বরিশালের ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী ছিল এর মধ্যে ব্যতিক্রম। উল্লেখ্য, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বরিশাল মন্ডলীর ভুমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯১৪ সালের আরম্ভে সাগরদী রোডের পার্শ্বে একটি সুন্দর সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই বৎসরের জানুয়ারী মাসে

Dhaka University Institutional Repository

বরিশালে বালকদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়েছিল। প্রায় একলক্ষ সাতষট্টি টাকা ব্যয়ে বর্তমান বালিকা বিদ্যালয় ও বোর্ডিং গৃহগুলো নির্মিত হয়েছিল। ১৯১৬ সাল বরিশালের খ্রীষ্টীয় উদ্যোগ সমিতির ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। ১৮৯৪ সাল হতে উদ্যোগ সমিতির কার্য এই অঞ্চলের সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করতেছিল। যার দরুন ১৯১৬ সালের উদ্যোগ সমিতি বরিশাল বাখরগঞ্জ জেলার সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে একটি উদ্দীপনাপূর্ণ প্রচার অভিযান করেছিল। জুলাই ও আগষ্ট মাসে ২৬২ টি কেন্দ্র হতে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করা হয়েছিল। এর ফলে ৫২৮ জন অবগাহন দ্বারা খ্রীষ্ট যীশুকে তাদের মুক্তি দাতা বলে প্রকাশ্যে স্বীকার ও গ্রহণ করেছিল। তবে উল্লেখ্য যে, বরিশালে খ্রীষ্টের এই বিজয় যাত্রার মূলে ছিল রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্ব, যিনি ১৮৮৪ সালে মিশনারীরূপে ভারতবর্ষে এসে তার কর্মজীবনের প্রায় ২৮ বৎসর বরিশালে অবস্থান করেছিলেন। যার ফলে বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট সমাজ গড়ে উঠেছিল। ১৯১৯ সালে তিনি সস্ত্রীক বরিশাল পরিত্যাগ করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ভুমিকা

প্রথম মহা যুদ্ধ শেষ হবার পরেই বৃটিশ ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে । বৃটিশ সরকারও এই আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করার নীতি গ্রহণ করেছিল। এ জন্যে ১৯১৯ সালে চালু করা হয়েছিল কুখ্যাত রাওলাট আইন। এই বৎসরেই অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সভায় সমবেত জনতার উপর পুলিশ ১৬০০ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করেছিল। গুলি বর্ষণের ফলে নিহত হয়েছিল ৩৭৯ জন এবং আহত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল ১২০০ জন। তখন সারা ভারত বর্ষে এই নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। এমন কি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ও এর তীব্র নিন্দা করেছিলেন।

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শুরু করেছিল এক অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট। এর লক্ষ্য ছিল "স্বরাজ্য অর্জন", স্বরাজ্যের তখন অর্থ করা হয়েছিল "Self rule within the Empire, If possible without, If necessary." একই সময়ে আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী) এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। অসহযোগ আন্দোলন ও ফিলাফৎ আন্দোলন দাবানলের মত অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের শহরে, গ্রামে, গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃটিশের সব কিছু এ দেশের মানুষের চোখে বাড়াবাড়ি, খারাপ ও বর্জনীয় হয়ে যায়। খ্রীষ্ট ধর্ম যেহেতু বৃটিশ শাসকদের ধর্ম সেহেতু রাজনৈতিক কর্মীদের ঘৃণা, ও বিদ্বেষ হতে খ্রীষ্ট ধর্ম বাদ পড়েনি। রেভারেন্ড ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস লিখেছেন মহাযুদ্ধের শেষে বাংলাদেশের সর্বত্র ঘোর রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারকগণ হাট বাজারে প্রচার করতে আরম্ভ করলে প্রচারকদের তাড়িয়ে দেয়া হত এবং খ্রীষ্ট ধর্ম বিদ্বেষীগণ সুসমাচার খন্ড ছিড়ে ফেলত। গ্রাম্য অঞ্চলের প্রচার কার্য্য বহু পরিমাণে বন্ধ করতে হয়েছিল। তখনকার, তৎকালিন পূর্ব বঙ্গের খ্রীষ্টীয় মন্ডলীগুলিও এই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব হতে মুক্ত থাকতে পারেনি। বিদেশী মিশনারী ও বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের মধ্যেকার পূর্বের খ্রীষ্টীয় সম্পর্কে কিছুটা ফাটল

Dhaka University Institutional Repository

ধরেছিল তবে সে ফাটল চিরস্থায়ী হতে পারেনি উপযুক্ত নেতৃবৃন্দের কর্মতৎপরতায়। সেই সময়ে বরিশালের অক্সফোর্ড মিশনের ফাদার স্ট্রং মন্ডলীর ভিতরে এই অসন্তোষকে এ দেশের খ্রীষ্ট ভক্তদের খ্রীষ্টের রাজ্যের জন্য প্রকৃত আত্মিক আগ্রহের ফলশ্রুতি বলে মনে করতেন। যার দরুন খ্রীষ্ট বিরোধী অসন্তোষ সমাপ্তির ইতিরেখায় পৌছে যায়। ১৯১৯ সালে তিনি বিদেশী খ্রীষ্টীয় মিশনারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বাংলাদেশের খ্রীষ্ঠীয় মন্ডলীর সম্পর্কের যে বিশ্লেষণ করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। যাই হোক, অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে এই শতাব্দীর কুড়ির দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমানের কাছে খ্রীষ্ঠ ধর্ম প্রচার করা অসম্ভব হয়ে পড়লেও চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ২/৩জন খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীর সদস্য হয়েছিলেন। ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটির রিপোর্টে রেভারেন্ড ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস লিখেছেন " ১৯২২ সালে আচার্য ওয়েঙ্গার লুসাই অঞ্চলের কার্যভার নিয়ে চলে গেলে আর্চায এল, পি, ওয়েব চট্রগ্রামে গেলেন। রাজনৈতিক আন্দোলন ও আথির্ক অসচ্ছলতা জনিত নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আচার্য ওয়েব ও তার সহকমর্কীগণ গ্রামাঞ্চলে এবং বিশেষত ঃ শহরে সু-সমাচার প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন।

এই বৎসরে গোপীনাথ নামে একজন হিন্দু যুবক খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। সু-সমাচার খন্ড বিখন্ড এবং অগ্নিদন্ড হতে দেখে এই যুবকটি প্রথমে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বিশেষত ঃ ছাত্রদিগের মধ্যে কার্য্য করার জন্য আচার্য্য ওয়েব একান্ত মনোযোগী হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি গসপেল হলে একটি ইয়ং ম্যানস ক্লাব খুলেন। ১৯২০ সালে গসপেল হলটি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এই বৎসরে একজন খিলাফৎ সেচ্ছাসেবক অবগাহন দ্বারা প্রকাশ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। একজন মৌলভীকে সু-সমাচার নিন্দা করতে শুনে এই সেচ্ছাসেবকটি সুসমাচার পড়তে আরম্ভ করেছিল।[৮]

১৯২৩ সালে ঢাকা শহরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন মুন্সী আলীম উদ্দীন ভূইয়া। তিনি ১৮৪৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি যখন খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তার বয়েস হয়েছিল ৮০ বছর। বাংলাদেশে খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাসে আলীম উদ্দীন ভুইয়ার মন পরিবর্তনের কাহিনী তুলনাহীন। কোরান ও হাদীসে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে সকল উক্তি আছে শুধুমাত্র সে সকল পাঠ ও বিচার বিশ্লেষণ করে আলীম উদ্দীন যীশুকে তার মশীহ অর্থাৎ পরিত্রানকর্তারূপে গ্রহণ করেন। তখনও তিনি বাইবেল পাঠ করেননি অথবা কোন খ্রীষ্টানের সাথেও তার পরিচয় হয়নি। কি ভাবে আলীম উদ্দীনের হাতে বাইবেল আসল সে সম্বন্ধে ঢাকার তৎকালীন ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী রেভারেন্ড এল, বেভ্যান জোন্স লিখেছেন, "এর কিছু কাল পরে তিনি আশ্চর্য ভাবে একখানি বাংলা বাইবেল সংগ্রহ করেছিলেন। কোন খ্রীষ্টানের নিকট তিনি ঐ বাইবেলখানি প্রাপ্ত হননি। বোধ হয় তিনি এই নিমিত্ত কোন খ্রীষ্টানের নিকট অগ্রসর হতে একটু সংকুচিত ছিলেন। তিনি একখানি খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রন্থ প্রাপ্ত হবার জন্য একান্ত ইচ্ছুক হওয়াতে একদিন যখন তিনি ঢাকাতেও তার কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে ছিলেন তখন তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে, কেহ যদি তাকে একখানি বাইবেল সংগ্রহ করে দিতে পারে তবে তিনি তাকে যথোচিতভাবে পুরস্কৃত করবেন। ঐ গৃহস্থিত কোন এক ব্যক্তির নিকটে একখানি পুরাতন বাইবেল ছিল। সে আলীম উদ্দীন কে আশ্চর্যান্বিত ও কৌতুহলীকৃত করণার্থে উক্ত বাইবেলখানি এনে আলীমউদ্দীনের হাতের উপর

Dhaka University Institutional Repository

ছুড়ে ফেলে বলল " এই যে, এই লও; মনে করিওনা যে ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার হইবে" আলীম উদ্দীন ঐ বাইবেলখানিকে সত্য সত্যই ঈশ্বর প্রদত্ব দান মনে করে উহা ঘরে নিয়ে এসছিলেন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে উহা পাঠ করতে থাকেন। এই বাংলা বাইবেল খানিতে একটি আশ্চর্য ইতিহাস ছিল। উহার দু দিকের মলাটের ভিতর যা যা লেখা ছিল তা হতে জানা গিয়েছে যে, উদ্যোগ সমিতির জানানা মিশনারী সোসাইটির কলিকাতাস্থ কোন এক মহিলা মিশনারী সর্ব প্রথমে কোন খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রীকে (ব্রাহ্মনবাড়ীয়া খ্রীষ্টান স্কুলের) ঐ বাইবেলখানি দান করেছিলেন। তারপর বাইবেলখানি পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় কোন মুসলমানের হস্তগত হয়।সেখান হতে ঐ বাইবেলখানি ঢাকায় কোন মুসলমানের নিকট আনীত হয়। তার হস্ত হতেই আলীম উদ্দীন উহা প্রাপ্ত হব। আলীম উদ্দীনের বাপ্তিস্মের সময়ে তাকে একখানি নূতন বাইবেল দান করে ঐ পুরাতন বাইবেলখানি তার নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছিল। [৯]

দীর্ঘ ২০ বৎসর মুন্সী আলীম উদ্দীন ভূইয়া ঐ বাইবেলখানি গভীর মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করে উপলব্ধি করেন যে, প্রকাশ্যে যীশু খ্রীষ্টকে মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করা তার কর্তব্য। তিনি স্বয়ং বলেছিলেন ঃ আমি প্রকাশ্যে খ্রীষ্টান বলে পরিচিত হব। খ্রীষ্টানের ন্যায় প্রান ত্যাগ করব এবং খ্রীষ্টানের ন্যায়ই সমাধিস্থ ও পুনরুত্থিত হব।[১০]

ঢাকা শরের নিকটবর্তী মানিকনগরে আলীম উদ্দিন ভুইয়ার মৃত্যু হলে তার পারিবারিক কবরস্থানে সমাধি দেয়া হয়। তার সমাধির উপর ঢাকার ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী যে স্মৃতি ফলকটি স্থাপন করেছিল তাতে নিম্ন লিখিত কথা গুলো

Dhaka University Institutional Repository

উৎকীর্ণ ছিল। IN AFFECTIONATE MEMORY OF MUNSHI ALIMUDDIN BHUIYA " A devout man and humble Seeker after truth..... Searched the christian scriptures and found Jesus, The way, the truth and the life."

মুন্সী আলীম উদ্দীন ভূইয়ার স্মরণার্থেঃ- একজন ধর্মনিষ্ঠ এবং নম্র, সত্যান্বেষী যিনি..... খ্রীষ্টীয় ধর্ম শাস্ত্র অনুসন্ধান করতঃ যীশুকে পথ, সত্য ও জীবন বলে জানতে পেরেছিলেন। জন্ম ১৮৪৩ সাল, বাপ্তিস্ম ১৯২৩ সাল, এবংমৃত্যু ১৯৩০ সালের ৩১ শে জুলাই ।

বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘঃ- বৃটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশে ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীসমূহের অতি শৈশবকালে ১৮৪২সালে শ্রীরামপুর বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীসমূহের সম্মিলনী স্থাপিত হয়। ১৮৮৩ সালে রেভারেন্ড গগনচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে গঠিত হয় খুলনা সম্মিলনী। এর পরে ১৮৯২ সালে বরিশাল বাখরগঞ্জ সম্মিলনী স্থাপিত হয়। পরে ধীরে ধীরে অন্যান্য সম্মিলনী গঠিত হতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে ডিষ্ট্রিকট মিশনারীই সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট হতেন। ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের সাথে এ সকল সম্মিলনীর প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ ছিলনা। জেলার মান্ডলিক সামাজিক সকল কাজ সম্মিলনীই পরিচালনা করত। সম্মিলনীর নিজস্ব বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য এর কর্মীবৃন্দ সম্মিলনীর মধ্য হতে অর্থ সংগ্রহ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েক বৎসরের মধ্যে জেলা সম্মিলনীর এই প্রাথমিক যুগের অবসান হয়ে দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে কোন কোন সম্মিলনী তাদের পরিচালিত স্কুলের শিক্ষকদের নিযুক্ত করত। স্কুলে এবং সম্মিলনীর মধ্যে কাজ করার জন্য ইংলিশ ব্যপ্টিষ্ট মিশন যে সকল কার্যকারী ধার দিত, তাদের বেতনের কতকাংশ সম্মিলনী ও কতকাংশ মিশন দিত। কার্যকারীদের কাজ পরিচালনার দায়ীত্ব মিশন ও সম্মিলনী যুক্তভাবে গ্রহণ করত। প্রত্যেক জেলা সম্মিলনী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল। সময় বিশেষে জেলা সম্মিলনীগুলো সমবেত হয়ে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয় সকল আলোচনা করত।

জেলা সম্মিলনীসমূহের এই শিথিল সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হয়ে যে সকল বাঙ্গালী ও ইংরেজ নেতা একটি কেন্দ্রীয় সম্মিলনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন রেভারেন্ড বিমলানন্দ নাগ। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে সাতটি জেলার সম্মিলনীর প্রতিনিধিগণ যশোরে সমবেত হয়ে একটি কেন্দ্রিয় সংঘ স্থাপন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। রেভারেন্ড নাগ কয়েকটি সম্মিলনীতে গিয়ে ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী সমূহকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। দীর্ঘ চার বৎসর আলোচনার পর ১৯২২ সালে বরিশালে সকল জেলা সম্মিলনীর মিলিত অধিবেশনে বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ সংস্থাপিত হয়। রেভারেন্ড অনুকুল চন্দ্র ঘোষ সংঘের সভাপতি এবং রেভারেন্ড অমৃত লাল সম্পাদক নিযুক্ত হন।

Dhaka University Institutional Repository

এ স্থানে উল্লেখ্য যে, ফরিদপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জেলায়, অষ্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যান্ড মিশনদ্বয়ের কর্মক্ষেত্রে যে সকল ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী ছিল সেগুলোকে নিয়ে ১৯২০ সালে "অষ্ট্রেলেসিয়ান বঙ্গ ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনী" গঠিত হয়। এই বৎসরই কুমিল্লা শহরে ৫-৭ ই মার্চে এই নতুন সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১১]

এর সভাপতি ছিলেন রেভারেন্ড সিন্ধুনাথ সরকার এবং সম্পাদক ও সহ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে রেভারেন্ড কৈলাশ খ্রীষ্টদাস ও শ্রী যুক্ত বিহারী লাল বাড়ৈ। "অষ্ট্রেলেসিয়ান বঙ্গ ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনীর" সংগঠনে রেভারেন্ড ওয়ালটার বেরীর অবদান ছিল সর্বাধিক। তিনি নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের মিশনারী রুপে বাংলাদেশে আসেন। কিন্তু এদেশে আসার পর পরই কোন কারণবশতঃ তিনি নিউজিল্যান্ড মিশন হতে অবসর গ্রহণ করে অষ্ট্রেলিয়ান মিশনে যোগ দেন। "অষ্ট্রেলেসিয়ান বঙ্গ ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনী" বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট ফেলোশীপ নামে পরিচিত। ১৯২২ সালে বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের বরিশাল অধিবেশনে অষ্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকলেও সংঘের সাথে "অষ্ট্রেলেসিয়ান বঙ্গ ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনীর" কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী

ক্যাথলিক মন্ডলির ইতিহাসে প্রথম মহা যুদ্ধকে একটি বিভাজক রেখা বলা যেতে পারে। যুদ্ধোত্তর কালের রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী যুদ্ধে পূর্বের মন্ডলী হতে ছিল অনেক আলাদা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এদেশের রোমান ক্যাথলিক

Dhaka University Institutional Repository

মন্ডলীতে যে দেশীয় নেতৃত্বের উন্মেষ ও বিকাশ দেখা যায় তার মুলে ছিলেন ঢাকার বিশপ ল্যাগ্রান্ড , ফাদার টিমথী ক্রাউলী, (পরবর্তীকালে বিশপ) ফাদার ডেলনী, ফাদার ম্যাংগেন , ফাদার কাষ্টেল্লী, ফাদার কার্নস, ফাদার ফ্লরী, ব্রাদার ইউজিন, ব্রাদার এন্ড্রু ,ব্রাদার যোয়াকিম এবংব্রাদার ওয়ালটার প্রভৃতি পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের মিশনারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। এ সকল মিশনারীদের অধিকাংশ ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রোটেষ্টান্ট দেশের নাগরিক ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১৯১১ সালের আদম শুমারী অনুসারে বাংলাদেশের খ্রীষ্টান জনসংখ্যা ছিল ৪০,০৫৪ জন। এই জন সমষ্টির ১৮,৪০৮ জন ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও যশোর জেলায় ক্যাথলিকগণ প্রোটেষ্টান্টদের অপেক্ষায় সংখ্যায় বেশি ছিলেন। অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিকদের বাস ছিল ঢাকা জেলায় মুঘল আমলের পর্তুগীজ পল্লীগুলোতে । ঢাকা অঞ্চলে তাদের সংখ্যা ছিল ১১,৭৮৩ জন। [১২]

প্রথম মহা যুদ্ধ শেষ হবার আগেই ঢাকা অঞ্চলে রোমান ক্যাথলিক মিশনারীগণ স্থানীয় ক্যাথলিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর তারা এদেশের রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীতে দেশীয় নেতৃত্ব গড়ে তুলার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। ১৯২১ সালে নেতা গঠনের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এর বাস্তবায়নে ফাদার ক্রাউলীর উল্লেখযোগ্য ভুমিকা ছিল। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা ডায়োসিসের বিশপ হয়েছিলেন।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, প্রথম মহা যুদ্ধের পর পরই তৎকালীন পূর্ব বঙ্গে এক অস্থির রাজনৈতিক অঙ্গনে এদেশের বিভিন্ন খ্রীষ্টান নেতাদের মধ্যে দেশীয় নেতৃত্ববোধ জন্ম নিয়েছিল।

দেশীয় নেতৃত্বের বিকাশঃ- অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী না হলেও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশের মানুষও তখন বৃটিশ শৃংখল হতে মুক্ত হবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে বিদেশী মিশনারীদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ইভানজেলীয় কাজে অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই "সেভেনথ ডে এ্যাডভেন্টিষ্ট" মিশন নামে একটি নতুন মিশন এই সময়ে ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার হিন্দু ও মুসলমানের নিকট খ্রীষ্টের সু-সমাচার প্রচার না করে ব্যাপ্টিষ্ট খ্রীষ্টানদের এ্যাডভেন্টিষ্ট খ্রীষ্টানে পরিণত করার জন্য ব্যাপক ভাবে কাজ আরম্ভ করে।[১৪]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের শ্রদ্ধা থাকলেও তারা বৃটিশ রাজদের প্রতি অনুগত ছিলেন। এই সময়ে বাংলাদেশে কর্মরত ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের মানসিকতার একটি চমৎকার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটির প্রথম সম্পাদক রেভারেন্ড এইচ এইচ ড্রাইবার ১৯২৭ সালে রচিত "These Forty Years" নামক গ্রন্থে। যাই হোক অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের ক্ষেত্রসমূহে (ব্রাহ্মনবাড়িয়া ও চাঁদপুর) দেশীয় খ্রীষ্টানদের

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাবের একটা আভাস পাওয়া যায়। ১৯২১ সালের বার্ষিক সম্মেলনের রিপোর্টে এতে বলা হয়।

" That the Baptist conference is deeply concerned for the gravity of the crisis which is agitating the people of India today. It records with thankfulness to God the service some of our missionaries have been able to render in one of the centres of political and industrial upheaval, its appreciation of the wise christian attetude of our missionaries towards the new India which is seeking to realize its national destiny and its gratitude to God for the christian fidelity of our Indian pastors and workers and the stead fastness of the Indian churches. H. H. Driver, Page 18.

অসহযোগ আন্দোলন যখন চরমে পৌঁছায় তখন নিউজিলান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের ব্রাহ্মনবাড়িয়া অবস্থানরত মিশনারীদের জন্য শহরের বহু প্রভাব শালী হিন্দু ও মুসলমানগণ উদ্বিগ্ন ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন বাংলাদেশের প্রোটেষ্ট্যান্ট মন্ডলী সমূহের দেশীয় নেতাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। তারা তখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, এ দেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর যে ঐতিহাসিক ভুমিকা রয়েছে তা সম্পাদন করার দায়িত্ব শুধুমাত্র বিদেশী মিশনারীদের নয়, বাংলাদেশে খ্রীষ্টের ক্রুশ সমুন্নত রাখার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। এই সময়ে এদেশের ব্যাপ্টিষ্ট, এ্যাংলিকান ও প্রেজবিটারীয়ান মন্ডলীতে এমন কয়েকজন দেশীয় নেতার সাক্ষাত পাওয়া যায় যারা শিক্ষা, দীক্ষা, খ্রীষ্টীয় চেতনা ও কর্ম তৎপরতায় বিদেশী মিশনারীদের সমতুল্য ছিলেন। বাংলাদেশের এই সকল খ্রীষ্টভক্তকে বিদেশী মিশনারীরা যে শুধু স্বাগতমই জানিয়েছিলেন তা নয়, সর্বোতভাবে তারা তাদের সহায়তা করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই দেশীয় খ্রীষ্টান নেতাগণ এদেশের প্রেটেষ্ট্যান্ট মন্ডলীকে চরম সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, এই সময়ে যে সকল নেতা যীশুর বিজয়ের জন্য প্রোটেষ্ট্যান্ট মন্ডলী সমূহকে পরিচালনা দান করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেয়া হল।

ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী

রেভারেন্ড অনুকূল চন্দ্র ঘোষ ঃ বরিশালের ছবিখাঁর পাড়ের এক নিষ্টাবান ব্যাপ্টিষ্ট পরিবারে তার জন্ম হয়। পিতার নাম অরুনোদয় ঘোষ। রেভারেন্ড ঘোষের ঠাকুর দাদা, বরিশালের বিখ্যাত ব্যাপ্টিষ্ট নেতা রাম শরন ঘোষের পৈত্রিক বাসস্থান চট্রগ্রামে হলেও বাল্যকাল হতেই তিনি পশ্চিম বাংলায় ছিলেন। ডঃ উইলিয়াম কেরী তাকে লালন পালন করেন ও পরবর্তীকালে বাপ্তিস্ম দান করেন। রেভারেন্ড অনুকূল চন্দ্র ঘোষ শ্রীরামপুর থিয়োলজিক্যাল কলেজে শিক্ষকতায় তার কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২২ সালে বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ গঠিত হলে রেভারেন্ড ঘোষ এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। তার পুত্র বিখ্যাত

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসক ডাঃ নির্মল চন্দ্র ঘোষ B.Sc. M.B, F.R.S.T.D.H (London) পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীতে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। পরবর্তী সনের "উড়াও বিজয় পতাকা" "জয় যিশু" বলে রেভারেন্ড অনুকুল চন্দ্র ঘোষের এই বিখ্যাত গানটি তার সময়ের বাংলাদেশের ঝড়ো রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথাই স্মরণ করে দেয়।

খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর অগ্রগতি খ্রীষ্টীয় চেতনাসম্পন্ন প্রবাহমান নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল। ১৯৩২সালে কার্য হতে অবসর গ্রহণের পরেও মন্ডলীতে যাতে নূতন নেতৃত্ব গড়ে উঠে সেই চেষ্টা রেভারেন্ড ঘোষ করে গিয়েছেন। "১৫"

রেভারেন্ড অমতৃ লাল সরকার এস. এ. বি. ডি ঃ- তার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন যশোর জেলার আন্দুল বাড়িয়া গ্রামের অধিবাসী। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে তারা ফরিদপুর জেলার পাথর ইউনিয়নের লাটেঙ্গা গ্রামে বসতি করেন। সেখানেই অমৃত লালের জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। তার শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার খুল্লতাত প্রেমানন্দ সরকার প্রেমানন্দ নিজেও ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক। শ্রীরামপুর কলেজে অধ্যাপনায় অমৃতলাল তার কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৯২২ সালে বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ গঠিত হলে তিনি এর প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর সংকটকালে তিনি শিক্ষকতা পরিত্যাগ করে সাংগঠনিক কার্যে নেমে আসেন। রেভারেন্ড ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস তার সম্পর্কে লিখেছেন ১৯২৮ সালে আচার্য অমৃতলাল সরকার খুলনায় আসেন। তার সময়ে প্রতি বৎসর সামার স্কুল হত। প্রায় ২০জন ছাত্র নিয়মিতভাবে বাইবেল ক্লাসে যোগ দিত। আচার্য

Dhaka University Institutional Repository

সরকার ইংরেজী ও বাংলা ভাষার সুপন্ডিত ছিলেন। তার শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও উপদেশ শুনে মন্ডলীর যুবকগণ মোহিত হত। অনেক যুবক এই সময়ে শাস্ত্র সমন্ধে যথেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করে মন্ডলীর তত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার অমায়িক, কোমল ও বিনম্র ব্যবহার লোকেরা বিমুগ্ধ হত।[১৬]

অমৃত লাল ছিলেন সু-সাহিত্যিক। তার রচিত "ভারত বন্ধু ডাঃ উইলিয়াম কেরী" "সু-সমাচার চতুষ্টয়" "প্রেরিতদের কার্য বিবরন" "খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। খ্রীষ্টীয় গান রচনাতেই তিনি যথেষ্ঠ দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার রচিত একটি ভক্ত গান, রঞ্জন করি আগমন, আমোদিত কর হৃদয় কানন, এখনও খ্রীষ্ট ভক্তদের অন্তরে এক অপূর্ব সুর লহরী সৃষ্টি করে।

রেভারেন্ড অমৃত লাল সরকারের দুই পুত্র। রেভারেন্ড সত্যানন্দ সরকার এম. এ. বি. ডি এবং অধ্যাপক নির্মলানন্দ সরকারও বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর পরিচর্যায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।[১৭]

রেভারেন্ড আই এন সরকারঃ রেভারেন্ড অমৃত লাল সরকার ১৯৩৩ সালে খুলনা হতে যশোর জেলায় বদলী হলে রেভারেন্ড আই, এন. সরকার সেখানে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ও সংঘের মিশনারীরূপে আসেন। রেভারেন্ড আই এন সরকারের আপ্রান যত্নে ও পরিশ্রমে ১৯৩৪ সালে নোবেল মেমোরিয়াল বোর্ডিং স্কুলটি পুনরায় কয়লা ঘাটায় স্থাপিত হয়। নমঃশুদ্রদের ঈর্ষাজনিত ঘোর প্রতিযোগিতা হেতু এবং ছাত্রাভাবে স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা জেলার ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী সমূহকে স্বাবলম্বী করার জন্য রেভারেন্ড সরকার নানা পন্থা অবলম্বন করেন। এদের অন্যতম ছিল জেলা সম্মিলনীর নামে একটি ছোট ধানের গোলা স্থাপন। তার চেষ্টার ফলে মন্ডলীগুলোর মধ্যে নানা জটিল গোলযোগের মীমাংশা হয়েছিল।[১৯]

রেভারেন্ড সরকারের সহকর্মী ছিলেন রেভারেন্ড ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস। তাদের প্রচারের ফলে ত্রিশের দশকের শেষ ভাগে খুলনা জেলায় খ্রীষ্টের রাজ্য দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করেছিল। হোসেন আলী নামে একজন মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। বাগের হাট জেলার অন্তর্গত মোল্লার হাট থানার ভান্ডার খোলা, কামার গ্রাম, চাউলটুরী, সরসপুর , দত্তডাঙ্গা, প্রভৃতি গ্রামে অনেক নমঃশুদ্র খীষ্টান হয়েছিল। এই সময়ে এই এলাকায় কর্মরত খ্রীষ্টীয় কর্মীদের ধারনা হয়েছিল যে, যদি সেবা কার্য্যে কোন ত্রুটি না হয় এবং আপ্রান চেষ্টায় এই অঞ্চলবাসীদের সেবায় রত থাকাযায় তবে অচিরে খুলনার দক্ষিণ ভাগ অপেক্ষা মোল্লার হাট অঞ্চলে খ্রীষ্টান সংখ্যা অধিক হবে।[২০]

কিন্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ তাদের আশা পূরণ হয়নি। চল্লিশের দশকে এই অঞ্চলের নব দীক্ষিত খ্রীষ্টানগণ স্বাজাতীয়দের উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরে যায়।[২১]

রেভারেন্ড প্রসাদচন্দ্র দাসঃ রেভারেন্ড দাস ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের একজন প্রচারক ছিলেন। রেভারেন্ড উলার্ড ও রেভারেন্ড সেলউর্ডের সাথে তিনি ত্রিশের দশকে রংপুর জেলায় প্রায় সর্বত্র খ্রীষ্টের সু-সমাচার প্রচার

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তার প্রচারের ফলে অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল এই সময়ে রংপুরের ব্যাপ্টিষ্ট খ্রীষ্টানগণ নানা স্থানে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় ছিলেন। তাদের মধ্যে কোন একতার বন্ধন ছিলনা। রংপুর জেলা ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনীর সংগঠনে একটি গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা ছিল রেভারেন্ড দাসের।

১৯৩২ সালের শেষাংশে বলদীপুকুরের একটি বড় সভা হয়েছিল। এই সভাতে আচার্য্য সেলউড ও আচার্য্য প্রসাদ চন্দ্র দাস, রংপুর জেলার মন্ডলীসমূহের একটি সম্মিলনী গঠনের আবশ্যকতা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করতঃ সভাস্থ সকল খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগিনীকে বুজিয়ে দিলেন। বহু আলোচনার পর স্থির হলো যেঃ- ১) রংপুর মন্ডলী সমূহ নিয়ে একটি সম্মিলনী গঠিত হবে এবং (২) সম্মিলনীর অন্তর্গত প্রত্যেক মন্ডলী তার আয়ের ২/৫ অংশ সম্মিলনীর কার্য্যে দান করবেন। এই সভার মধ্যে এবং এর পরে, প্রত্যেক খ্রীষ্টানের জীবনে প্রভুর ইচ্ছা কি, তা জানার জন্য সকলের মধ্যে একটি প্রবল আকাঙ্খা দেখা গেল। অনতিবিলম্বে সম্মিলনীর সাহায্যে প্রত্যেক মন্ডলী তার প্রতিবেশীদের মধ্যে সু সমাচার প্রচার করতে আরম্ভ করল। আচার্য্য প্রসাদ চন্দ্র দাস দুইমাস যাবৎ বলদিপুকুর মন্ডলীতে থেকে সেখানকার ভ্রাতা ভগিনীদেরকে যথেষ্ঠ সাহায্য করেছিলেন এবং তাদের সহযোগিতায় চারদিকে সু সমাচার প্রচার করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে রংপুর সম্মিলনী বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের সাথে সংযুক্ত হলো।[২২]

রেভারেন্ড ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ- রেভারেন্ড ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ছিলেন ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ও সংঘের মিশনারী। ১৯২৭ সালে ঢাকা এবং ১৯৩৮ সালে খুলনা জেলার মিশনারী কাজে অংশ গ্রহণ করেন। খুলনায় কিছুকাল

Dhaka University Institutional Repository

তিনি থিওলোজিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ছিলেন। বঙ্গে যীশুর বিজয় যাত্রা নামক ইতিহাস গ্রন্থের রচনা তার প্রধান কৃতিত্ব। পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বঙ্গে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের দেড়শত বৎসরের (১৭৯২-১৯৪২) কাজের নির্ভর যোগ্য ইতিহাস এতে রয়েছে। গ্রন্থটি ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার কয়েক বৎসর আগে হতেই রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতগণ যখন সারা বিশ্বে প্রোটেষ্ট্যান্ট খ্রীষ্টানদের রোমান ক্যাথলিকে পরিণত করার জন্য ব্যাপক কর্মতৎপরতা শুরু করেন তখন বাংলাদেশে রেভারেন্ড ক্ষিতীশ চন্দ্র দাসই সর্বপ্রথম এর প্রতিবাদে সত্যের সন্ধান নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৯৩৫ সালে খুলনা হতে প্রকাশিত হয়েছিল। সত্যের সন্ধানের ভুমিকায় তিনি ইহা রচনার যে দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন তা পাঠ করলে এই সময়ে এদেশে প্রোটেষ্ট্যান্ট মন্ডলীর উপরে রোমীয় মন্ডলীর তীব্রতা প্রকাশ পায়।

বাংলাদেশে খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাসে ১৯৩৬ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরের জুলাই মাসে বাংলাদেশের প্রথম খ্রীষ্টীয় পত্রিকা নবযুগ চাঁদপুর হতে আত্মপ্রকাশ করে। বৃটিশ যুগে বাংলা ভাষায় খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল পশ্চিম বাংলার শ্রীরামপুর ও কলিকাতা। তবে তৎকালীন পূর্ব বঙ্গে অনেক অনেক খ্রীষ্টান সাহিত্যিক থাকা সত্বে ও এ দেশে তাদের সাহিত্য চর্চার কোন মাধ্যমে ছিলনা। রেভারেন্ড ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস নবযুগ তাই এক নবযুগের সূত্রপাত করেছিল। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য এই যেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের (হযরত ইসা আল মশীহ) ধর্মতত্ব এবং তৎসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করতে পারা যায়। পত্রিকাটি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের সর্বশ্রেষ্ট কীর্তি। রেভারেন্ড বি. এন. ইউ ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। পত্রিকাটি এখনও টিকে আছে। পরবর্তীকালের বাংলাদেশের ক্যাথলিক পত্রিকা প্রতিবেশী এবং এংলিকান পত্রিকা সুহৃদ সংবাদের পথিকৃৎ নবযুগ।

নবযুগের দীর্ঘ পথ যাত্রার প্রথম দশ বৎসরে (জুলাই ,১৯৩৬ নবে, ডিসে. ১৯৪৬) যাদের লেখা এতে প্রকাশিত হয়েছিল তারা হলেন, রেভারেন্ড বি. এন. ইউ, মোহন চন্দ্র সরকার, শশাংক মোহন দাস, পন্ডিত শ্রী পরমানন্দ দত্ত। দর্শন শাস্ত্রী, আবুল হোসেন তালুকদার। রেভারেন্ড মহেন্দ্র কুমার, সরকার, মনোরঞ্জন সরকার ডি, এন, সাঁৎ, উপেন্দ্র কুমার দাস, মৌলভী ষ্টীফান জলীল, কনক লতা সরকার, জিতেন্দ্র কুমার দাস, রমেশচন্দ্র রায়, বিধু ভূষন দেউরী, রেভারেন্ড এইচ, এ, জোনস, ও আরো অনেকে।

বৃটিশ রাজত্বের শেষ ভাগে ময়মনসিংহের গারো ব্যাপ্টিষ্টদের মধ্যে ও স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশ লাভ করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হতেই গারো ব্যপ্টিষ্টদের মধ্যে এমন কয়েকজন নেতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের সঠিক নেতৃত্বে গারো ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীসমূহ স্বাবলম্বনে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে মাত্র কয়েকজন গারো নেতার কথা বলা হলো। যারা হলেন রেভারেন্ড বিনয় ভূষন সাংমা, (১৯১৬) মিঃ গোবিন্দ্র দারেং ও মিঃ কানাইলাল সাংমা ১৯২৮ মিঃ গিরিশচন্দ্র চিসিম ১৯৪০ সাল নাগাদ স্থানীয় নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাংলিকান মন্ডলীঃ দুই- মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে (১৯১৮-১৯৩৯) বাংলাদেশের এ্যাংলিকান মন্ডলীর মধ্যেও দেশীয় নেতৃত্ব পরিপক্কতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। এই সময়ে, যে কয়েকজন দেশীয় খ্রীষ্ট ভক্তের ত্যাগ, বিশ্বস্ততা এবং কঠোর পরিশ্রমে এদেশে এ্যাংলিকান মন্ডলীর স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হয়েছিল তারা হলেন ফাদার মহেন্দ্র চক্রবর্তী, ফাদার আন্দ্রিয় পাঞ্জা, ফাদার মাইকেল, ব্রাদার ভূপাল সরকার, রেভারেন্ড মনোরঞ্জন সরকার ও ডিকন বৃন্দাবন অধিকারী ছাড়া অন্যান্যরা সকলেই ছিলেন সেন্ট এন্ড্রুজ ব্রাদার হুডের সদস্য।

উল্লেখ্য, রেভারেন্ড মনোরঞ্জন সরকার বরিশালের বিলাঞ্চলে ফাদার প্রাইয়রকে পালকীয় কার্য্যে সাহায্য করতেন। ত্রিশের দশকে খুলনার দক্ষিণভাগে অবস্থিত শেহাল বুনিয়াতে ফাদার প্রাইয়রকে পরিচালনায় অক্সফোর্ড মিশনের কাজ সম্প্রসারিত হলে রেভারেন্ড সরকারকে বরিশালের কলিগ্রাম পেরিসের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শেহাল বুনিয়াতে এ্যাংলিকান খ্রীষ্টানদের পরিচর্যা করতেন ডিকন বৃন্দাবন অধিকারী । বাংলাদেশের এ্যাংলিকান মন্ডলী এদেশের শিক্ষিতদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। অক্সফোর্ড মিশনের ফাদার নার্লটের মতে এদেশে খ্রীষ্টানদের সামাজিক অনগ্রসরতা এবং বৃটিশ মিশনারীদের উপর তাদের অত্যাধিক নির্ভরশীলতাই ছিল এর মূল কারণ।[২৩]

প্রেসবিটারীয়ান মন্ডলী ঃ- প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত রাজশাহী জেলায় ইংলিশ প্রেসবিটারীয়ান মিশনের সেবা ও সু-সমাচার প্রচার সত্বেও ধর্ম বিস্তার লাভ করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে যে কয়েকজন মিশনারীর কঠোর পরিশ্রমের

Dhaka University Institutional Repository

ফলে রাজশাহীতে প্রেসবিটারীয় মন্ডলী শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়েছিল তাদের অন্যতম ছিলেন রেভারেন্ড প্রিয় কুমার বারুই। ১৯৩২ সালে তিনি মিশনারীরূপে রাজশাহীতে আসেন এবং ৩৩ বৎসর মন্ডলীর পালকীয় কার্য ও সু-সমাচার প্রচার কার্য করার পর অবসর নেন।[২৪]

প্রেসবিটারীয়ান , মন্ডলীর একজন সদস্য হিসেবে পি. কে বারুইর ভুমিকা ছিল প্রশংসনিয়। উল্লেখ্য, রেভারেন্ড বারুই ছিলেন একজন সু - সাহিত্যিক । তিনি অনেকগুলি খ্রীষ্টীয় গন্থের রচয়িতা। অনুবাদ সাহিত্যেও তিনি যথেষ্ঠ দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তার অন্যতম সাহিত্য ধর্ম বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস । জাতীয় চার্চ পরিষদের সাহিত্য বিভাগ গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছে। গ্রন্থটিতে এ দেশে ইংলিশ প্রেসবিটারিয়ান মিশনের কাজের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। মিশন কার্য হতে অবসর গ্রহণের পরে রেভারেন্ড বারুই EPCC (East pakistan Christian council) এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিন বৎসর তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বৃটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম এলাকা অর্থাৎ দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলায় খ্রীষ্ট ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। সে সময়ে বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে খ্রীষ্টের বাক্য পথের উপরে অথবা কাঁটাবনে পতিত হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ রাজত্বের শেষ প্রান্তে এই সকল অঞ্চলেই খ্রীষ্টের রাজ্য দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করেছিল। বৃটিশ শাসনের অবসানের আগেই বাংলাদেশের সকল এলকায় খ্রীষ্টীয় মন্ডলী স্থাপিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের খ্রীষ্ট ধর্ম বিস্তারের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনাটিও ঘটেছিল এই সময়ে। ১৯৩৬ সালের ২৯ শে মার্চ, হবিগঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ বিপিন চন্দ্র দে, এম, এ (ঈশান স্কলার) হবিগঞ্জ শহরের ওয়েলশ প্রেসবিটারীয়ান উপাসনালয়ে খ্রীষ্টে ধর্মে দীক্ষিত হন।[২৫] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে রংপুর ময়মনসিংহের উপজাতীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টে ধর্মের প্রসারের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময় ময়মনসিংহ শহর গোবিন্দশ্রী (ময়মনসিংহ) হবিগঞ্জ শাসেয়স্তাগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চাঁদপুর ও পার্বত্য চট্ট গ্রামে অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। সৌভাগ্যক্রমে নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা নবযুগ এর মাধ্যমে এই সময়ের কয়েকজন শিক্ষিত নব দীক্ষিত খ্রীষ্টানদের আত্মসাক্ষ্য আমাদের হাতে এসে পৌছায়। এই সকল নবদীক্ষিতদের মন মানসিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারকগণ এদের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

১৯৩৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন শ্রী নীল কমল চক্রবর্তী । তিনি ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার মেড্ডা বাজারে কাল ভৈরবের মন্দিরে তান্ত্রিক সাধনা করতেন। তার আত্মসাক্ষ্যে তিনি লিখেছেন আমি হিন্দু ধর্মান্তগত বহু শাস্ত্র পাঠ করে নানা দেবদেবীর পূজা ব্রত, উপবাসাদিকার্য এবং বহু তীর্থাদি দর্শন পূর্বক বুঝলাম যে, পাপ হতে মুক্তি লাভ করে স্বর্গীয় শান্তি ভোগ করা সম্ভব নয়। তৎপরে মুঙ্গের জেলায় জৈনক খ্রীষ্টান প্রচারকের নিকট হতে একখানা বাইবেল প্রাপ্ত হয়ে তা পাঠ করতে লাগলাম। ..... আমি পবিত্র আত্মার সাহায্যে বুঝতে পেরেছি যে, আমার আর জন্ম গ্রহণ করতে হবে না । উক্ত পবিত্র আত্মা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তারা (হিন্দুরা) আমাকে

Dhaka University Institutional Repository

মহা সাধক ও অধ্যক্ষ বলে যথেষ্ঠ সম্মান করতেন এবং তাদেরকে উপদেশ দান করতাম। কিন্তু বুঝতাম যে, অন্ধকার থেকে শিক্ষা দিতেছি। অতএব আমি সেই প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করে দীক্ষিত হয়েছি।[২৬]

চাঁদপুর মহকুমার মতলবগঞ্জ থানার অর্ন্তগত বালুচর গ্রামের একটি বিশিষ্ট হিন্দু পরিবার হতে মিঃ ভুবনচন্দ্র সরকারের সপরিবারে ১৯৩৮ সালের ৩০ শে অক্টোবর; রবিবারে নিজ গ্রামে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ভুবন বাবু শিক্ষিত লোক, ক্রমাগত চার বৎসর যাবৎ খ্রীষ্ট ধর্ম এবং খ্রীষ্টীয় সমাজের নানা সভা সমিতিতে যোগ দিয়ে আসতেছিলেন। এই দীক্ষা কার্য উপলক্ষে চাঁদপুর খ্রীষ্টীয় মন্ডলী হতে বাবু রমেশচন্দ্র রায়, রসময় দান, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, বিশ্বম্বর দাস, মহেন্দ্রকুমার সরকার , রেভারেন্ড আর জিব্রাউন, মিস এম বুশ, ডাঃ মিস ইনারা সকলে উপস্থিত হয়ে দীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেছিলেন । এই ব্যাপারে দেখার জন্য বালূচর ও লামচর গ্রামের শতাধিক স্ত্রী পুরুষ বালুচর নদীঘাটে সমবেত হয়েছিল।[২৭] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাক্কালে চাঁদপুর মহাকুমাতে প্রভু যীশুর জীবন্ত শক্তি কার্য করেছিল।[২৮]

মাত্র কয়েক বৎসরে অনেকে সেখানে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। এ সকল নব দীক্ষিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টের রাজ্যে প্রবেশ করেন। তিতারকান্দিতে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মন ভদ্রলোক সপরিবারে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি হিন্দুদের তীর্থকেন্দ্র বৃন্দাবনে চিকিৎসা কাজের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সু-সমাচার প্রচার করেছিলেন। বোয়ালীয়াতে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক সপরিবারে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। আশাকাটিতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সপরিবারে প্রভু যীশুকে ত্রানকর্তা বলে স্বীকার করেন। পরে তিনি খ্রীষ্টীয়

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মতত্ত্ব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। সকদীর একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন । আমিরা বাজের বাখরপুরে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুব খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নিজ বাড়িতে থেকে ব্যবসা দ্বারা জীবন যাপন করতেন। চেঙ্গার চরের একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবক খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নিজ দেশে থেকে চিকিৎসকের কাজ করতেন।ইচলী গ্রামের একজন শিক্ষিত যুবক খ্রীষ্টান হয়ে ঘড়ি ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।

এই সময়ে কুমিল্লা শহরে খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি লাভ না করলেও অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের যে কার্যের প্রভাব ছিল তা পশ্চিম বাংলার লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রী নারায়ন চৌধুরী ধর্ম সাগরের দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীদের পরিচালিত শিশু মনের আকর্ষণের হেতু সানডে স্কুলের প্রশংসা করেছেন ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার কয়েক বৎসর আগেই পার্বত্য চট্টগ্রামে (বান্দর বন জেলা সহ) ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের কাজের ফলে খ্রীষ্টের মন্ডলী দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করেছিল । চন্দ্রঘোনা মিশন হাসাপাতাল এই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলে মিশনারী তৎপরতার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের জুন হতে ১৯৩৬ সালের অক্টোবরের মধ্যে চন্দ্রঘোনায় যারা খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন, কালী কান্ত চাকমা, রিগা, খায়াৎ, চাইখ্রু খায়াং, বৈখ্যা চাকমা, সরলা বিশ্বাস, মনসন চাকমা, আলাউদ্দিন হাওলাদার , আমেনা, অগত্যা চাকমা, শত্রুঘ্ন চাকমা, কলা

Dhaka University Institutional Repository

খায়াং, গোপাল গুর্খা, ফোলং এর মা কেওলং, রিগ্যার মা, কুকুজ্জা ও মহম্মদ হোসেন।[২৯]

খাগড়াছড়ি শহরের ৬ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত উচ্চ বেতছড়ি গ্রামের বৃহৎ ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীটিও এই সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। বেতছড়ি ব্যাপ্টিষ্টগণ জাতিতে চাকমা। বৌদ্ধ চাকমাদের সাথে খ্রীষ্টান চাকমাদের সামাজিক সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কোন খ্রীষ্টান মারা গেলে বেতছড়ির ব্যাপ্টিষ্টগণ কবর দেননা, পুড়িয়ে ফেলেন। এর একামাত্র ব্যতিক্রম মিঃ সুরেন্দ্র বিকাশ চাকমা। তার মৃতদেহ তার ইচ্ছা অনুসারে না পুড়িয়ে কবর দেয়া হয়েছিল। মিঃ সুরেন্দ্র বিকাশ চাকমা বেতছড়ি মন্ডলীর সম্পাদক ছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে রেভরেন্ড ওয়েঙ্গার রাঙ্গামাটি হতে এবং ডাঃ বটমস চন্দ্রঘোনা হতে পার্বত্য চট্রগামে মিশনারী কাজ পরিচালনা করতেন। ১৯৩৩ সালে চন্দ্রঘোনায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যাপ্টিষ্ট সম্মিলনী গঠিত হলে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপ্টিষ্টগণ এই সময়ে বাংলাদেশের বৃহত্তর ব্যাপ্টিষ্ট সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পূর্বে এদেশে চার্চেজ অব গড মিশনের ও কাজ দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করেছিল। ১৯৩৮ সালে ডাঃ মিস, ই, এফ, গিলবার্ট এন ডি, ডাক্তার মিশনারীরূপে বগুড়ায় আসলে বাংলাদেশে চার্চেজ অব গড মিশনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। দীর্ঘ ৩৪ বৎসর ডাঃ গিলবার্ট এই দেশে আর্ত মানুষের সেবা করে ১৯৭২ সালে নিজ মাতৃভূমি

Dhaka University Institutional Repository

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করেন। তার পরিচালনায় বগুড়া মিশন হাসপাতাল উত্তর বঙ্গের একটি শ্রেষ্ট সেবাসদনে পরিণত হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও বৃটিশ রাজত্বের অবসানঃ খ্রীষ্টাগণ যখন বাংলাদেরে প্রায় সকল এলাকায় বিজয় লাভ করতেছিলেন ঠিক তখনি ১৯৩৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়া আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে। জার্মানীর ব্লিৎস বিমান বহর এবং প্যানজার ট্যাংক বাহিনীর আক্রমনে বৃটেন কোন ঠাসা হয়ে পড়লে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হবার উজ্জল সম্ভবনা দেখা দেয়।

১৯৪০সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে ভারতের একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাব গৃহীত হল। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপান বৃটেনের হাত হতে বার্মা দখল করে নিলে অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠে। এই বৎসরের ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পরের দিন (৯ই আগষ্ট) কংগ্রেসকে বে আইনী দল বলে ঘোষণা করা হয়। বৃটিশ সরকারের এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সমগ্র ভারতে বিক্ষোভ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ঝড় বয়ে যায়। কিন্তু এই সময়ে বাংলাদেশের খ্রীষ্ট ধর্মের উপর কোন হামলা হয় নি। নবযুগের ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় গির্জায় অগ্নিকান্ডের এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এ ঘটনাটি ঘটেছিল চাঁদপুরে।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ যুগে পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশে চাউলের ঘাটতি পূরণ করা হত বার্মা হতে চাউল আমদানী করে। বার্মা বৃটেনের হাত ছাড়া হয়ে যাবার ফলে পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশে তীব্র খাদ্য ও সংকট দেখা দেয়। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে চাউলের বাজার আগের মতই স্থিতিশীল ছিল কিন্তু মে মাসে চাউলেরর দর দ্বিগুণ হয়। আগষ্ট মাসে চাউলের দাম দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বহু লোক অকাল মৃত্যু বরণ করলেও বাংলাদেশে এই সময়ে কোন খ্রীষ্টান অনাহারে মৃত্যু বরণ করেছে বলে জানা যায় না খ্রীষ্টীয় মন্ডলী ও মিশনসমূহের যৌথ প্রচেষ্টায় এই বিপর্যয়ে এড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হতেই এদেশের খ্রীষ্টীয় মন্ডলীতে শ্রেণী সংঘাত তীব্রতর হয়ে উঠে। যুদ্ধের ফলে নানা রকম কাজ ও ব্যবসার সুযোগ গ্রহণ করে এক শ্রেণীর খ্রীষ্টান রাতারাতি যথেষ্ঠ অর্থের মালিক হন এতে মন্ডলীর সদস্যগণ ধনী ও দরিদ্র এই দু শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অতীতে প্রায় সকল সদস্য কই অর্থনৈতিক শ্রেণীভুক্ত থাকায় মন্ডলীতে খ্রীষ্টীয় প্রেমের কোন অভাব ছিলনা মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তার প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বড় দিন, যুদ্ধের ফলে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীতে সেই বড় দিন অপ্রেমের প্রদর্শনীতে পরিণত হলো।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনেক খ্রীষ্টানের নৈতিক চরিত্রের অবনতিরও কারণ হয়েছিল । ১৯৪৩ সালে চাউলের দাম বৃদ্ধির আগেই বরিশালে অক্সফোর্ড মিশন পরিচালিত বোর্ডিং স্কুল সমূহের খ্রীষ্টান ছেলে মেয়েদের যথেষ্ঠ চাউল মিশন ক্রয় করে মিশন কেন্দ্রে, চাউল রাখার উপযুক্ত স্থান না থাকায় মন্ডলীর একজন বিশিষ্ট ব্যাক্তির খালি গোলায় তা রাখা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বস্ত বলে ব্যাক্তিটির সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু রাতারাতি ধনী হবার প্রলোভন সেই ব্যাক্তি এড়াতে না পারার ফলে মিশনের সমস্ত চাউল খোয়া যায়।

(But the temptation to make quick money proved to great for him, and we lost our stock.[30]

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেস হয়ে যাবার পরেও কোন কোন খ্রীস্টীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অর্থ আত্মসাৎ করার প্রবণতা থেকে যায়। East Bengal Baptist union এর পরিচালিত আর্নল্ড মেমোরিয়েল হাসপাতালেও নানা অনিয়ম দেখা দেয়। ইউনিয়নকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউনিয়নের যে সকল নেতা চাঁদপুরে এক বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হয়েছিলেন তারা হলেন যথাক্রমে,

সভাপতি	ঃ	ডাঃ নির্মল চন্দ্র ঘোষ
সভাপতি	ঃ	শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র সরকার
সভ্যগণ	ঃ	যোগেন্দ্রনাথ পন্ডিত, নন্দ কুমার বিশ্বাস হেমেন্দ্র নাথ সরকার অরুন কুমার দেবনাথ
পরিদর্শক	ঃ	শচীন্দ্র কিশোর দে।

বাংলাদেশে প্রোটেষ্টান্ট সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানদের মধ্যে ব্যাপ্টিষ্টগণই সংখ্যা গরিষ্ঠ, কিন্তু তারা একতাবদ্ধ নয়। চাঁদপুর অধিবেশনে East Bengal Baptist union এর নেতাগণ বাংলাদেশের ব্যাপ্টিষ্ট খ্রীষ্টানদের মধ্যে যাতে বিভেদ দুর হয়ে একতা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই চেষ্টা ও করেছিলেন।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারিত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে একথাই পষ্ট হয়ে উঠে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিএ বাহিনী জয়লাভ করলে ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত বৃটেনের জাতিয়তাবোধে উদ্ভুদ্ধ ভারতবর্ষ শাসন করা আর সম্ভব ছিলনা। ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তৎকালীন বৃটেনের শ্রমিক সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৯৪৭ সালের জুনের মধ্যে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের শাসন ভার ভারতীয়দের হাতে অর্পন করবে। আর এই ঘোষণানুসারে বৃটিশ সরকার ভারতকে তিন টুকরা করে ১৯৪৭ সালের ১৪ও ১৫ই আগষ্ট পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, খ্রীষ্টান মিশনারীদের উপর চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যদিও বলা হয়ে থাকে যে, বৃটিশ রাজ ভারত বর্ষ হতে বিদায় গ্রহণ করলেও খ্রীষ্টের রাজ্য এদেশে চিরস্থায়ী হয়ে রয়ে যায় । রয়ে যায় কথাটি ঠিক তবে পরে বিভিন্ন কারণে ও দেশ ভাগের ফলে এদেশে খ্রীষ্টান সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। কারণ তৎকালীন পূর্ব বাংলার শিক্ষা, শিল্প, সভ্যতা ও ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল কলিকাতাকে কেন্দ্র করে। খ্রীষ্টীয় সমাজেরও মূল পত্তন হয়েছিল শ্রীরামপুর ও কলিকাতায় ।[৩২]

384661

স্কুল, কলেজ , হাসপাতাল প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঐ অঞ্চলে। যেমন কলিকাতায় নামকরা - St, pauls college, Scottish church college st. xaveirs college, Bishops college, Serampur college serampur University, Bonkora christian college , Berhampur Teacher's Training College প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাছাড়া কলিকাতা বিষ্ণুপুর, কৃষ্ণনগর, চাপড়া, মেদিনীপুর ও আসানসোলের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি ছিল খ্রীষ্টান ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র। যদিও খ্রীষ্টান মিশনারীদের তৎপরতায় এদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল নির্মিত হয়েছিল কিন্তু তা কলিতার তুলনায় ছিল অত্যন্ত নগন্য । এই কারণে দেশ বিভক্তির ফলে শিক্ষা, দীক্ষা ও চাকুরীর সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে বহু খ্রীষ্টান পশ্চিম বাংলায় গমন করেছিল বলে তৎকালীন পূর্ব বাংলার খ্রীষ্টীয় সমাজের জনসংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। পূর্ব বাংলার খ্রীষ্টান ছাত্র/ ছাত্রীর পশ্চিম বাংলায় শিক্ষা লাভের দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় তৎকালীন পূর্ব বাংলার মিশন ও মন্ডলীর চেষ্টায় বরিশালে তিনটি ময়মনসিংহ জেলার বিরিশিরিতে দুটি ও বগুড়ার খঞ্জনপুরে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ও প্রতি জেলায় হাইস্কুল এবং ঢাকায় দুটি কলেজ স্থাপন করেছিল। দেশ বিভাগের পরে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার চেষ্টাও চলতে থাকে এবং এর ফলে রাজশাহী ও চন্দ্র ঘোনার হাসপাতাল দুটির আমূল পরিবর্তন করা হয় এবং জয়রামকুড়া, বগুড়া, বরিশাল চট্টগ্রামে আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সম্বলিত নতুন হাসপাতাল খোলা হয়। উল্লেখ্য, দেশ বিভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব বাংলায় মাত্র মুষ্টিমেয় উচ্চ শিক্ষিত যুবক/ যুবতী ছিলেন কিন্তু পরে এ শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পায় আর তা সম্ভব হয়েছিল খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের কর্ম কৌশল ও দক্ষতার ফলে। আর এই কারণেই বিভিন্ন খ্রীষ্টান মিশনারীদের আত্মত্যাগ এদেশের ইতিহাসে অম্লান হয়ে রয়েছে এবং থাকবে।[৩৩]

আলোচিত অধ্যায়টিতে ১৯০৫ সাল হতে ১৯৪৭ সাল নাগাদ এ দেশে বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের কর্ম কৌশল ও খ্রীষ্টান ধর্মের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক মাত্রায় দেশের খ্রীষ্টান সমাজের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটিকা সমূহ

১। The Modern Muslim political Elite in Bengal
A. Z. N. Karim
University of London, 1964.
p-192-93

২। বাংলাদেশের ইতিহাস সামাজিক ও সাংস্কৃতিক (৩য়খন্ড)
১৭০৪-১৯৭১
সম্পাদকঃ- সিরাজুল ইসলাম
পৃঃ-১৪৩

৩। Second Vatican Ecuminical council, Decree on the Missionary Activity of the Church Adgentes 9, Ef, chapter 11,10,18

৪। Glimpses of Bogra
Viola G, Hershey
p-59

৫। বাংলাদেশে খ্রীষ্ট মন্ডলীর ইতিহাস
প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
পৃঃ-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

৬ কুমারী এলেন আর্নল্ডের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

Rev, K. K. Das

পৃঃ-৬

৭। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস

প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত

পৃঃ-১১৭

৮। শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস

পৃঃ-৮২

৯। শ্রী পিতর সরকার

আলীমুউদ্দিন ভুইয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী

পৃঃ ১০- (ভূমিকা)

১০। শ্রী পিতর সরকার

আলীমুউদ্দীন ভুইয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী , পৃঃ-১১।

১১। B, B, U এর সম্পাদক মিঃ সাইমন মুন্সীর প্রেরিত তথ্য)

১২। Peter Me Nee

Crucial Issues in Bangladesh

p-263

Dhaka University Institutional Repository

১৩। ঐ

p- 264-269 ও ক্যাথলিক পঞ্জিকা

১৪। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস

প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত

পৃঃ-১৫৯-৬০

১৫। ঐ

১৬। শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস, পৃঃ-৯১

১৭। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস

প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত

পৃ-১৯১

১৮। শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস, পৃঃ-৭৬

১৯। শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস, পৃঃ-৭৬

২০। নবযুগ চাঁদপুর , অক্টোবর ১৯৩৯

২১। শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস, পৃঃ-৭৬

Dhaka University Institutional Repository

২২। ঐ

২৩। A Hundred Yeas in Bangladesh
p-89

২৪। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
রেভাঃ পি কে বারুই
পৃঃ-১৬৭

২৫। নবযুগ, চাঁদপুর জুলাই ১৯৩৬

২৬। নবযুগ, চাঁদপুর আগষ্ট ১৯৩৬

২৭। নবযুগ, চাঁদপুর ডিসেম্বর ১৯৩৯

২৮। নবযুগ, চাঁদপুর অক্টোবর ১৯৩৬

২৯। নবযুগ, চাঁদপুর নভেম্বর ১৯৩৮

৩০। A Hundred Years in Bangladesh
p-93

৩১। প্রতিবেশী, ঢাকা

৩২। নবায়ন, কলিকাতা

৩৩। সমতান ঢাকা ও ঐক্যতান।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের আর্থ সামাজিক কর্মকান্ড।

আমাদের এ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর উন্নয়নে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অবদান কে অস্বীকার করে ইতিহাসকে বিকৃত করা যায় না। তাই দেখা যায় এ দেশের উপজাতিয় সমাজ ও কৃষক সমাজে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রধান কাজ ছিল ঐ সব সমাজের মানুষকে ধর্মান্তরিত করে ঐ সব মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা। এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী কোহেন ও ইয়ামস বলেন যে, ''মিশনারী কর্মীরা উপজাতি ও কৃষক সমাজের সংস্কৃতির তুলনায় নিজেদের সংস্কৃতিকে উন্নত বলে বিবেচনা করে'' আর এই কারণকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ এ দেশের মানুষের উন্নতির লক্ষে আর্থ সামাজিক ক্রিয়া কান্ড গড়ে তুলেছিল। যে সকল ক্রিয়া কলাপ অর্থনীতি ও সামাজিক ক্রিয়া কান্ডে জড়িত তাকেই আর্থ সামাজিক কর্মকান্ড বলে।

সামাজিক ক্রিয়াতে দেখা যায় সামাজিক প্রথার সংস্কার সাধন, বিশপ দুফাল যখন বঙ্গের বিশপ নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন তিনি দেখেছিলেন যে সাধারণত সব এলাকায় খ্রীষ্টানগণ কিছু কিছু হিন্দু প্রথা ও কুসংস্কার মানে ঃ যেমন বিধবাদের পুনরায় বিবাহ নিষেধাজ্ঞা, পক্ষান্তরে বিপত্নীকেরা পুনরায় রিবাহে বসতে পারে, আর যুবতী বিধবারা অভাবে অথবা পরিবেশের কারণে বেশ্যা হয়ে জীবন যাপন করে। দুফাল বিশপ হবার দু এক বছর পরে

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের নৈতিক অবক্ষয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টানদের জন্য একটি নিয়ম জারি করেছিলেন যে, বিপত্নীক পুরুষ বিধবা স্ত্রী লোককে বিয়ে করতেই হবে, কোন যুবতী মেয়েকে যদি সে চায় তাহলে মন্ডলী তার বিবাহের ব্যবস্থা করবে না। প্রথম দিকে এই বিধি বেশ কিছু প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে তা বাস্তবায়িত হতে থাকে।[১]

আর এ আলোকেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে তৎকালীন পূর্ব বঙ্গ যখন রেনেসাঁস নামে চিহ্নিত হতে থাকে তখন কতিপয় খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ প্রর্বতন , ওব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব হয়। আর তা সম্ভব হয়েছিল বহুল আকারে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রর্বতনের ফলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু মানুষ খ্রীষ্টান সমাজের কাছে কতখানি ঋনী তা কারো কাছে অবিদিত নয়। আবহমান কাল ধরে খ্রীষ্টানদের মধ্যে একটি মূল্যবোধ প্রকট ভাবে কাজ করছে; আর সেই মূল্যবোধ হচ্ছে যেখানে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার সেখানে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়া। এ দেশে খ্রীষ্ট ধর্মের আগমন মুহুর্ত থেকে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ খ্রীষ্টান মিশনারীদের মধ্যে প্রকট ছিল। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাইমারী থেকে কলেজ পর্যন্ত । এই প্রতিষ্ঠান গুলোর মাধ্যমে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ শহর ও বিশেষ ভাবে গ্রাম অঞ্চলে পেয়েছে শিক্ষার আলো। শহর ও বিশেষ ভাবে গ্রাম অঞ্চলে খ্রীষ্টানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকটবর্তী এলাকাতে শিক্ষার হার অন্যান্য এলাকায় তুলনায় অনেক বেশী। এই সব এলাকায় ধনী গরীব সকলেই শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। স্কুল কলেজের শিক্ষায় যারা অপারগ তাদের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন অঞ্চলে খ্রীষ্টান সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে কারিগরী স্কুল ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবিস্থা। তাছাড়া দেশের সংখ্যালঘু ও অবহেলিত আদিবাসী সমাজগুলোর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতে এবং তাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং সংরক্ষন করতে বিভিন্ন খ্রীষ্টান মিশনারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন।

প্রেমজাত সেবা খ্রীষ্ট ধর্মের অন্যতম মূল কথা। স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টের জীবনের আদর্শ ও তাই। একই আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অজ্ঞ নিরক্ষর দুঃস্থ দরিদ্র, আর্ত পীড়িতদের সেবায় খ্রীষ্টান সমাজ যে অবদান, রেখেছে অনেকের কাছেই তা জ্ঞাত, বিগত চারশত বছরে খ্রীষ্টানদের ইতিহাস তার দীপ্ত সাক্ষ্য। বিভিন্ন দয়া ও সেবা কাজের মধ্যে অসুস্থদের চিকিৎসা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয, অনাথদের রক্ষা, কুষ্ঠীদের সেবা, মৃত্যুদ্বারে উপনীত অথচ পরিত্যক্ত পুরুষ নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে সেবা কাজ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এই সেবা কাজে খ্রীষ্টান সমাজ অগ্রগামী। সেবার উদ্দেশ্যে দেশের কোন কোন অঞ্চলে খ্রীষ্টান এলাকা গুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতাল এবং অনাথ শিশু ও কুষ্ঠদের আশ্রম।[২]

তাই এখানে পষ্ট হয়ে উঠে যে, খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারে ও বিস্তারে শিক্ষা ও মানবপ্রেমকে পুঁজি করে বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের কর্তৃক প্রাইমারী স্কুল থেকে কলেজ এবং কারিগরি স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতাল এবং অনাথ শিশু ও কুষ্ঠদের আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকান্ডে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল বিধায় খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের আর্থ সামাজিক কর্মকান্ডকে দুটি স্তরে বিভক্ত করে যেমন শিক্ষা মূলক ও জনসেবামূলক কর্মকান্ড নিয়ে এ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

সেন্টএন্ড্রুজ মিশন

বিংশ শতকের প্রথম দিকে সেন্টএন্ড্রুজ মিশন ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড গড়ে তুলে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছিল

জনসেবামূলক কাজ

শুধু ধর্ম প্রচারই নয় জনসেবার দিক দিয়ে সেন্ট এন্ড্রুজ মিশনের কাজ অনন্য হয়ে রয়েছে। জনসেবায় এই মিশনের ফাদার/ব্রাদাররা এতই আত্মনিবেদিত ছিল যে, তারই ফলস্বরুপ জানা যায় যে, ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় তার প্রতিক্রিয়া হালুয়াঘাট অঞ্চলে ও দেখা দেয়, সহস্র সহস্র অনাহারে ও অর্ধাহারে দিন পাত করতে থাকলে এই সকল অভুক্ত জীর্ন শীর্ন নর নারীদের দেখে কোমল প্রান ফাদার চক্রবর্তীর প্রান কেঁদে উঠেছিল তিনি দৈনিক একবার অতি সাধারণ খাবার খেয়ে দিন পাত করতে থাকেন এবং তাঁর সমকর্মীগণ ও তাঁর মত একাহারী হয়েছিলেন আর একবেলার খাদ্য গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এযে, গরীব জন সাধারণের প্রতি এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু কি তাই হালুয়া ঘাটে কর্মী ও ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সে সময়ে জলের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। সুতরাং মিশন স্থির করেছিল যে পানীয় জলের জন্য ১০০ হস্ত দীর্ঘ ও ৬০ হস্ত প্রস্থ একটি পুকুর খনন করাবে। এই কার্যের জন্য আনুমানিক ১৪০০ টাকা ব্যয় হবে বলে এই অর্থের জন্য একটি আবেদন চর্তুদিকে প্রেরণ করা হয়েছিল। ১৯২৪ সালে এই পুকুর খনন করা হয়েছিল এবং ব্যয় হয়েছিল ১৫৬৪টাকা। এই পুকুর শুধু মিশনের কর্মীদের জন্য নয় জনসাধারণও ব্যবহার করত। জনসেবামূলক কাজে সেন্ট এন্ড্রুজ মিশনের অবদান হচ্ছে হালুয়াঘাট বালক/ বালিকাদের বিদ্যালয়, বোর্ডিং, চিকিৎসালয়, মাতৃকেন্দ্র সদন স্থাপন। এ সকল জনসেবামূলক কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় শত শত বালক/ বালিকা শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়েছে ও পাচ্ছে। প্রসূতিরা চিকিৎসিত হচ্ছে এবং দরিদ্র গ্রাম্য লোকেরা অল্প মূল্যে ঔষধ পাচ্ছে।

শিক্ষামূলক কাজঃ-

ধর্মের গুরুত্ব বুঝতে হলে অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষার প্রয়োজন। আর হালুয়াঘাট অঞ্চলের অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বেলে সেন্ট এন্ড্রুজ মিশন এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষামূলক কার্যে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য শ্রী যুক্ত জয়নাথ চৌধুরীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রচেষ্ঠায় হালুয়াঘাট, বড় জানি ও সোহাগপুরে তিনটি পাঠশালা স্থাপিত হয়। তখন হালুয়াঘাট স্কুলে দুজন এবং অপর দুটি স্কুলে দুজন শিক্ষক নিয়োজিত হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৮ সালে প্রদত্ত মিঃ শ্রীযুক্ত জয়নাথ চৌধুরীর প্রতিবেদন দেখা যায় যে, হালূয়াঘাট ৪৪, বড়জানিতে ৫ এবং সোহাগ পুরে ২জন খ্রীষ্টান ছিল। ১৯০৯সালের জুলাই মাসে ৫৪ বৎসর বয়সে এই ত্যাগী পুরুষের মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মন কুলে জন্ম গ্রহণ করে যীশূ খ্রীষ্টের পরিচয় লাভ করে তিনি যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে খ্রীষ্টকে মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিসস্তভাবে খ্রীষ্টের সেবা করেছিলেন। হালুয়াঘাট ও বিরিশিরি অঞ্চলের গারো খ্রীষ্টানদের নিকট মিঃ শ্রীযুক্ত জয়নাথ চৌধুরী অমর হয়ে আছেন। মিঃ চৌধুরীর মৃত্যুর পরে ১৯০৯ সাল হতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত হালুয়াঘাটের কর্মভার গ্রহণ করার মত কোন যোগ্য ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি। এই সময়ের মধ্যে ঢাকার চ্যাপলেন টি, ই, টি শোর একবার এই স্থান পরিদর্শন করেছিলেন। যাই হোক, অবশেষে শ্রী যুক্ত কিরন চন্দ্র মৃধা, শ্রী যুক্ত রাখাল চন্দ্র ব্যাপারী, শ্রীযুক্ত আন্দ্রিয় পাঞ্জা, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস ১৯১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী হালুয়াঘাট পৌছে সেন্ট এন্ড্রুজ মিশনের ভিত্তি স্থাপন করে (হালুয়াঘাট অঞ্চলে) শিক্ষা প্রচারের কার্যে নিজদিগকে নিয়োজিত করে সেন্ট এন্ড্রুজ মিশনের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন।

১৯১১ সাল হতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত যদিও ফাদার মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বরিশালে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন তবুও প্রতি ছুটিতে এবং প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য সময়ে হালুয়াঘাট এসে তার সহকর্মীদের শিক্ষা বিস্তারের কার্যে উৎসাহ ও পরামর্শ দান করতেন। মিশনের কর্মীগণ দিনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন এবং রাত্রীতে যদিও হিংশ্র জন্তুর উৎপাত ছিল তথাপি গ্রামে গ্রামে ভ্রমন করে সু-সমাচার প্রচার করতেন। শিক্ষা ও সু-

Dhaka University Institutional Repository

সমাচারের কাজ পাশাপাশি চলত। কিন্তু ১৯৫০ সালের দিকে ফাদার চক্রবর্তী অসুস্থ্য হয়ে মৃত্যুবরণ করলে সেন্ট এন্ড্রুজ মিশনের যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছিল তা অপূরণীয়। কিন্তু হালুয়াঘাটের বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত থাকাকালীন সময়ে তার কার্য তার হাতের গড়া তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত কয়েকজন বাঙ্গালী ও গারো কর্মীদের বিস্বস্ত সেবার ফলে মিশনের কার্য অদ্য পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। এখনও হালুয়াঘাট বালক/ বালিকাদের বিদ্যালয়ে শত শত বালক/ বালিকারা শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। হালুয়াঘাট বোর্ডিং এ অনেক শিক্ষার্থীরা শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি থাকারও সুযোগ পাচ্ছে।[৩]

চার্চেজ অব গড মিশন

তৎকালীন পূর্ব বঙ্গের উত্তর বাংলায় বগুড়া জেলায় চার্চেজ অব গড মিশন বিংশ শতকের প্রথম দশকের গোড়ার দিকে শিক্ষা ও জনসেবা কার্যের মধ্যে দিয়ে আর্থ সামাজিক কর্মকান্ড গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলো।

শিক্ষামূলক কাজঃ-

এ দেশের খ্রীষ্ট ধর্মের আগমন মুহূর্ত থেকে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ খ্রীষ্টান মিশনারীদের মধ্যে প্রকট ছিল। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাইমারী থেকে কলেজ পর্যন্ত। এ সকল প্রতিষ্ঠান গুলোর মাধ্যমে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ শহর ও বিশেষ ভাবে গ্রাম অঞ্চলে খ্রীষ্টানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকটবর্তী এলাকার তুলনায় ছিল অনেক বেশি। এ সব এলাকায় ধনী গরীব সকলেই শিক্ষার সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। স্কুল কলেজের শিক্ষায় যারা অপারগ তাদের জন্য কোন কোন অঞ্চলে খ্রীষ্টান সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে কারিগরী, স্কুল ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা। এ ছাড়া দেশের সংখ্যালঘু ও অবহেলিত আদিবাসি সমাজগুলোর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতে এবং তাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং সংরক্ষন করতে খ্রীষ্টান মিশনারীরা অগ্রণী ভূমিকার মধ্যে চার্চেজ অব গড মিশনের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। উল্লেখ্য , উনবিংশ শতক হতেই তৎকালীন পূর্ব বাংলায় ইউরোপীয় শিক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে ও এদেশে ভাল স্কুলের সংখ্যা খুব কম থাকায় মিশন স্কুলের মাধ্যমে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করা সহজ ছিল।

চার্চেজ অব গড মিশন ১৯০৮ সালে জয়পুর হাট মহকুমার অর্ন্তগত খঞ্জনপুরের একটি সাওতাল পল্লীতে ছেলে মেয়েদের জন্য খুলার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এই স্থানের মিঃ চরন সরেন ও তার স্কুলের সহপাঠি গঙ্গা কিছু লেখা পড়া জানতেন। মিঃ সরেন তার বাড়ীর উঠানে মিশন স্কুলটি চালাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই স্কুলে কয়েকমাসের মধ্যেই ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ১৮তে পৌছেঁছিল। কিন্তু স্কুলে যে শুধু ছাত্র ছাত্রীরাই আসত তা নয় , ক্লাস চলা কালে সুয়োর, মহিষ কুকুর এবং ছানা পোনারা ও সেখানে ঘুরে বেড়াত।[৪] কিছুকাল পরে মিশন সেই গ্রামেই তিন ডলারের বিনিময়ে একটি চালাঘর কিনলে স্কুলের সেখানে স্থানান্তরিত হয় । এই স্কুলের নাম ছিল খঞ্জনপুর মিশন স্কুল । খঞ্জনপুরেই মিশনে স্কুলে স্থাপিত পবার পরেই সেখানে মিশনের -একটি- উপকেন্দ্র ও স্থাপিত হয় । সেখানে ১৯০৯ সালে মিঃ চরন সরন প্রথম খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন । সাঁওতালদের মধ্যে মিশন কাজের সফলতা দুর্গাপুরেও একটি উপ

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র ও একটি স্কুল স্থাপন করতে মিশনকে উৎসাহিত করেছিল। বগুড়া শহর হতে ১২ মাইল পশ্চিমে দুর্গাপুর অবস্থিত । তখন এই স্থানে বর্ণ হিন্দুদের বাস ছিল। দুর্গাপুর উপকেন্দ্রে পালক ও প্রচারক ছিলেন মিঃ সূর্য -বিশ্বাস , স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মিঃ এন কে বৈরাগী এবং রেভান্ডে এইচ ডাব্লিও কাভার। দুর্গাপুরে খ্রাষ্টের রাজ্য বিস্তার লাভ করতে না পারলেও এই সময়ে খঞ্জনপুরের চার মাইল উত্তর পশ্চিমে পাহানন্দ গ্রামে ও সান্তাহারে ও মিশনের কাজ সম্পসারিত হয়েছিল [৫] উল্লেখ্য ,বগুড়া জেলার কয়েকজন পুরুষ মিশনারী কর্মী এসেছিলেন কিন্তু কেহই অধিক দিন এদেশে ছিলেন না তারাই বিস্বস্তভাবে ১৯০৫থেকে১৯৪৭সলে এমন কি এখন ও করছেন।

সেবামূলক কাজ ঃ

সেবা মূলক কার্যের দিক দিয়ে চার্চেজ অব গড মিশনের নাম বগুড়া জেলায় অনন্য হয়ে রয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শন, শিক্ষা দান, ধর্ম প্রচার এমন কি হাসপাতাল পরিচালনা মহিলা মিশনারীগণ করে আসছেন। অনুমান ৩০ বৎসর পূর্বে ডাঃ গিলবার্ট নামক একজন মহিলা ডাক্তার বগুড়ায় এসে মহিলা ও প্রসূতিদের জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার যত্ন চেষ্টা সুচিকিৎসার ফলে এই হাসপাতালের বহু শ্রী বৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। জয়পুর হাটের নিকটবর্তী খঞ্জনপুরে মিস হার্সীর চেষ্টায় একটি জুনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এর মান উন্নীত হয়ে উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে এবং একজন বাঙ্গালী অধ্যক্ষের পরিচালনায় সুনামের সাথে কার্য পরিচালিত হচ্ছে।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

বগুড়া জেলায় চার্চেজ অব গড মিশন কর্তৃক খ্রীষ্টান ধর্ম যেমন সম্প্রসারিত হয়েছিল কয়েকটি স্থানে সফল ভাবে, তেমনি প্রচার কার্যের শুরুর দিকে বাধা বিপত্তি এসেছিল প্রচুর। যেমন মিস হার্সী বগুড়ায় আসার প্রায় ৩০ বৎসর আগে কয়েকজন ইংরেজ মিশনারী সেখানে এসেছিলেন শহরের একটি বাজারে তারা খ্রীষ্টের বাক্য প্রচার করতে আরম্ভ করলে একদল মুসলমান উত্তেজিত হয়ে তাদের লক্ষ করে ইট পাটকেল ছুড়েছিল। এর ফলে ইংরেজ মিশনারীরা সেই যে, বগুড়া ত্যাগ করলেন আর ফিরেননি। কিন্তু ১৯০৫ সালে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। মিস হার্সী এবং বাওয়ার্স দম্পতি যে দিন বগুড়া শহরে পা দেন সে দিনই তারা প্রচুর সু-সমাচার ও প্রচারপত্র বিক্রয় ও বিলি করেছিলেন। কেউ তাদের বাধা দেয়নি। ১৯০৫ হতে ১৯১১ সালের মধ্যে বগুড়া জেলায় ২৫ হাজার খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মিসহার্সী লিখেছেন। "Our workers are faithful and they deserve a great deal of credit in this part of work."

ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন

শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

ইংলীশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন শিক্ষামূলক কার্যের দিক দিয়ে অগ্রগামী হয়ে অনেক প্রশংসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ঢাকা জেলায় ১৯০৫ সালের পরে সমগ্র পূর্ব বাংলার বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে অন্যান্য স্থানের মত ঢাকাতে ও মিশন কাজ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল। বহু অসুবিধা সত্ত্বেও

Dhaka University Institutional Repository

১৯১১ সালে রেভারেন্ড নোবল ঢাকা শহরের নমঃশুদ্রদের মধ্যে অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। এ সকল স্কুলের সাহায্যে তিনি তাদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষাও খ্রীষ্ট ধর্ম বিস্তার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। ঢাকা শহরে নমশুদ্র ছাত্রদের জন্য তিনি নোবল মেমোরিয়াল হোষ্টেল নামে একটি হোষ্টেল স্থাপন করেছিলেন। ঢাকা শহরের মত পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় ও এ সময়ে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীর সহায়তায় শিক্ষার আলো জ্বলে উঠেছিল। দিনাজপুর জেলায় সাওতাঁলরা খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তারা শিক্ষার আলো দেখতে পেলে তাদের জীবন হতে নানা প্রকার কুসংস্কার দুরিভূত হয়েছিল। তাদের মধ্যে তখন আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠেছিল। ১৯১৪ সালে দিনাজপুর জেলায় একটি বালক বোর্ডিং স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব দেয়া হলে সেই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজও করা হয়েছিল। ময়মনসিংহের গারো উপজাতিয় লোকেরা বিংশ শতকের দিকে শিক্ষিত হয়ে উঠলে তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তা সম্ভব হয়েছিল ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণের মধ্যে দিয়ে। ১৮৮৬ সালে বিরিশিরিতে ছেলেদের স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৯৮ সালে কানাই সাংমা ৯৬ টি গ্রাম্য স্কুলের ইন্সপেক্টর ছিলেন। ১৮৯৯ সালে বিরিশিরিতে মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯০১ সালে বিরিশিরিতে Industrial school স্থাপন করা হয়। এভাবে বিভিন্ন সময়ে ময়মনসিংহের গারো উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়েছিল ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের সুযোগ্য ফাদার , মাদার , ব্রাদার এবং সিষ্টারগণ। বিংশ শতকের প্রথম দশকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন শিক্ষামূলক কর্মসূচী বেশ সফলতার সাথে সমাপ্ত করেছিল। ১৯০৩ সালে চন্দ্রঘোনাতে ১৪ জন শিক্ষক কাজ করতেন। যে সময়

Dhaka University Institutional Repository

চন্দ্রঘোনাতে তিনটি ক্ষুদ্র বোর্ডিং স্কুল ছিল। মন্ডলীর সভ্যদের বিশ্বাস ও মন্ডলীর প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য জ্ঞান যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য আচার্য হিউজেস যথাশক্তি যত্ন ও চেষ্টা করেছিলেন। এ সময়ে সাধারণ ধারনা হয়েছিল যে, কেবল বোর্ডিং স্কুলের সাহায্যে পার্বত্য জাতির উন্নতি হতে পারে। ১৯০৯ সালের কার্য্য বিবরণীতে লেখক বলেছেন আমরা যখন উন্নততর শিক্ষা প্রাপ্ত প্রচারক ও শিক্ষক পাব তখন আমাদের সমস্যার সমাধান হবে। এই বৎসরই রাঙ্গামাটির বোর্ডিং স্কুলটি চন্দ্র ঘোনাতে উঠে যায়। উল্লেখ্য, গারো ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীর ইতিহাসে যেমন বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীর ইতিহাসেও তেমন ১৮৮০ সাল একটি স্মরণীয় বছর। এই বৎসরে মাতৃপিতৃহীন বালিকাদের জন্য বরিশালে একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত হয়। অবহেলিত নারী সমাজের নিকট মহা আর্শিবাদ স্বরুপ এই স্কুলটি ১৯৫২ সালের তদানিন্তন প্রধান শিক্ষিকা মিস উষা বিশ্বাসের চেষ্টায় হাইস্কুলে পরিনত হয়। উনবিংশ শতকের আশির দশকে বরিশাল জেলায় দশটি গ্রাম্য পাঠশালায় প্রায় ২০০জন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যাভ্যাস করতেছিল। এ সময় জেলার নানা স্থানে এমন কি সুদূর ভোলা মহকুমাতেও ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের প্রচেষ্ঠায় শিক্ষার আলো জ্বলে উঠলে অনেকেই খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য, ১৯১১ সালে বরিশাল ফরিদপুর অঞ্চলে ৫১টি ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীর সভ্য সংখ্যার ২,৪০০ জন এবং সমাজের জনসংখ্যা ৭২০৯ জন ছিল। ৪৫টি গ্রাম্য পাঠশালায় ১৩২৩জন এবং ৩৯টি সান্ডে স্কুলে ৪৩৫ জন খ্রীষ্টীয়ান ও অখ্রীষ্টীয়ান ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা লাভ করতে ছিল। ১৯১৪ সালে বরিশাল শহরে বালকদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল খোলা হয়েছিল। ১৯১২ সালে এই স্কুলটির পরিকল্পনা ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটি অনুমোদন করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৫ সালে স্কুলটি উচ্চ ইংরেজী স্কুলে উন্নীত হয়। এ দেশের খ্রীষ্টীয়ান সমাজের নেতাদের মধ্যে অনেকেই এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

অশিক্ষিত খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে খুলনার ব্যাপ্টিষ্ট খ্রীষ্টীয়ানগণ বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে সকল মন্ডলীর পাঠশালা ছিল না সে সকল মন্ডলীতে এই সময়ে পাঠশালা স্থাপিত হয়। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, ১৯১০ সালে রেভারেন্ড ডব্লিউ মিশনের খুলনা আগমনের ফলেই ইহা সম্ভব হয়েছিল। কয়লা ঘাটায় একটি মধ্য ইংরেজী বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন। তিনি স্বয়ং এই স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। এই স্কুলটি দ্বারা খুলনা জেলার প্রভুত কল্যান সাধিত হয়েছে। খুলনার মত যশোর জেলাতেও শিক্ষার আলো জ্বলে উঠলে অনেক লোক খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। রংপুর জেলায় বিংশ শতকের প্রথম দশকে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটি শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা বিস্তার কার্য সমাপ্ত করেছিল। উল্লেখ্য, রংপুর জেলার মহেশ লতায় একটি স্কুল স্থাপিত হলে উদ্বীতে দুটি পরিবার খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে স্থানে স্থানে নতুন স্কুল স্থাপিত হয়। স্থানে স্থানে নতুন স্কুল স্থাপিত হবার ফলে অনেক পরিবার খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আর এটা সম্ভব হয়েছিল ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশানের শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণের মধ্য দিয়ে।[৭]

সেবামূলক কাজঃ-

ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন সেবামূলক কার্যের দিক দিয়ে এদেশের মানুষের মনে বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এই মিশনের সেবামূলক কাজ পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর এ কারণে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের অবদান এ দেশের মানুষ স্মরণ করে রেখেছে এবং রাখবে।

সেবামূলক কার্যের মধ্যে দিয়ে জনগণের কল্যানের জন্য ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বেশ প্রশংসার দাবী রাখে। এই মিশন ঢাকা জেলায় ১৯১২ সালে সদরঘাটে বিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন হোষ্টেল নির্মাণ করে। ১৯১১ সালে ডাঃ টাইচম্যান ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীরুপে কার্যভার গ্রহণ করলে তিনি চট্টগ্রাম বাসীদের কল্যানের জন্য চন্দ্রঘোনার ক্ষুদ্র মিশন হাসপাতালটিকে একটি উৎকৃষ্ট হাসপাতালে পরিণত করেন। তাছাড়া ডাঃ টাইচম্যান ১৯১৩ সালে চন্দ্রঘোনায় একটি কুষ্ঠাশ্রম ও স্থাপন করেন। ১৯১৪ সালে চট্টগ্রাম শহরের জামাল খান এলাকার ডাঃ টাইচম্যান একটি গসপেল হল নির্মাণ করেন। ১৯০১ সালে রেভারেন্ড পি, সি, নল ময়মনসিংহে গ্রাম্য শিক্ষকদের জন্য বাৎসরিক ক্লাস স্থাপন করেছিলেন হাতের কাজ, কৃষি, কার্যের সুবিধার জন্য। যার ফলে পরবর্তী সময়ে Industrial school এ উন্নীত হয়। তাছাড়া এ সময় ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, রংপুর, যশোর , ফরিদপুর বরিশাল চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে জনগণের কল্যানের জন্য বিভিন্ন সময়ে হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, ফার্মেসী স্কুল কলেজ বিভিন্ন অনাথ শ্রম প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপন করে এক অমর কীর্তি রেখে যেতে সক্ষম হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের জনগণ আজও শ্রদ্ধার সাথে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের কাজ স্মরণ করে এবং করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় প্রচারের কার্যে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বিশেষ ভুমিকা পালন করেছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রচার করতে হলে সেবামূলক কাজ হাতে নিতে হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ধনী গরীব সকল ধরণের লোকদের সেবা করেও ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের ধর্মীয় কাজ কোন কোন অঞ্চলে সফল হতে পারেনি । তবে সফল হতে না পারলেও এদেশের জনগণের মনে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীদের কাজ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে যা নিঃসন্দেহে আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে মিশনের কার্যে ভাটা পড়লেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের কার্যে ভাটা পরেনি। যার ফলে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের শিক্ষমূলক এবং সেবামুলক কার্যের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রচার কার্য ও প্রশংসনীয় গতিতে এগিয়ে গেলে ময়মনসিংহের গারো, চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামের সাওঁতাল উপজাতিয় লোকেরা খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আর তা সম্ভব হয়েছিল ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের কৃতিত্বমূলক কার্যের মাধ্যমে । বৃটিশ যুগে তৎকালীন পূর্ব বাংলার বরিশাল ফরিদপুর অঞ্চল ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল কলিকাতা। ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের অপর দুটি কীর্তি, ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস এবং শ্রীরামপুর কলেজ ও অবস্থিত ছিল পশ্চিম বাংলায়। ১৯৪৭সালে ভারত বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলায় খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের কাজে অন্যান্য মিশনের তুলনায় ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনই সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। পাকিস্তানের প্রথম দশকে এ দেশে এই মিশনের কাজে কোন উদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নি। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক হতে নতুন নতুন মিশনারীর এদেশে আগমনের ফলে কাজে এক নবোধ্যম দেখা দিয়েছিল। উল্লেখ্য, বৃটিশ রাজত্বের শেষ দিকে এই মিশন যেমন বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের সাথে সংযুক্ত থেকে এর মিশনারী তৎপরতা চালাত ঠিক তেমনি পাকিস্তানি আমলেও ব্যাপ্টিষ্ট ইউনিয়ন অব পাকিস্তান (সংঘ) এর সাথে সংযুক্ত থেকেই এই মিশন এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের কাজে ব্রতী ছিল। এখানে অর্থাৎ সর্ব শেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলে এই মিশন সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল বিধায় চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে এর কার্যের সাল উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ চল্লিশ দশকের প্রথম দিকের পর হতে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন এদেশে কার্য চালাতে অক্ষম ছিল। তবে পরে এ অক্ষমতা দূর করতে সক্ষম হয়েছিল বলেই এই মিশন তৎকালীন পূর্ব বঙ্গে আর্থ সামাজিক কর্ম কান্ড গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী

শিক্ষা জনসেবামূলক কার্য

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগেই ঢাকা অঞ্চলে রোমান ক্যাথলিক মিশনারীগণ স্থানীয় ক্যাথলিকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকার সম্ভবত অন্যান্য অঞ্চলেও ক্যাথলিকগণ খুব অনগ্রসর ছিল। সে সময়ে পল্লী অঞ্চলে যে কয়টি মিশন স্কুল ছিল তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। প্রথম মহাযুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯১৪ সালের পূর্বে রাঙ্গামাটিয়া স্কুলে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের কলার পাতায় নিজেদের তৈরী কালি কলমে লিখতে হত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষা দেয়া হত ধারাপাত, শুভংকরী ও অংক ভূত প্রেতের উৎপাত , তাবিজ করজ ও নানা কুসংস্কার তখন ক্যাথলিক সমাজকে দুর্বল করে রেখেছিল এই সময়ে রোমান ক্যাথলিকদের খ্রীষ্টীয় চেতনাও ছিল অতি নিম্ন স্তরে প্রণাম মারীয়া জপমালা ও ক্রুশাচিহ্নের উর্ধে ইহা তখনও উঠতে পারেনি।[৯]

তবে প্রথম মহা যুদ্ধের পর ক্যাথলিকদের শিক্ষার স্তর উন্নত হয়। সে সময় সেমিনারীর ছাত্রদের পাঠ্য তালিকায় প্রধান বিষয় ছিল ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য। পাঠ্যপুস্তক ছিল ভার্জিল সিসেরা ও সিজার। মাঝে মাঝে ছাত্রদের ল্যাটিন ভাষায় নাটক করতে হত। বিশেষ ভাবে যখন কোন বিশিষ্ট ভিজিটর রোম হতে আসতেন, বাংলাদেশের ছাত্রদের ল্যাটিনে নাটক দেখে তারা অবাক হয়ে যেতেন। ছাত্রদের ল্যাটিন পড়াতেন ফাদার ডেলনী এবং কলিকাতা হতে আগত মিঃ সানডেল। যারা ইংরেজীতে দুর্বল ছিলেন তাদের প্রাইভেটভাবে ইংরেজী শিখাতেন ভুমেঙ্গু মাষ্টার। বোর্ডিং মাষ্টারদের কাজও তিনি করতেন ।

বান্দুরায় ফাদার ডেলনী ইছামতির বাণী নামে একটি সাপ্তাটিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। পরবর্তীকালে এর নাম বদলিয়ে টিন হর্ন রাখা হয়। এই পত্রিকা টাইপ রাইটারে ছাপা হত। প্রতি সপ্তাহে এর শত শত কপি করার জন্য ফাদার ডেলনী তিনজন টাইপিষ্ট নিযুক্ত করেছিলেন। সেমিনারী ও মিশন স্কুলের প্রায় ৩০/৪০ জন ছেলে দুইদিনে পত্রিকাগুলির উপর ডাক টিকেট

Dhaka University Institutional Repository

লাগাত। সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে এইগুলি ঠেলাগাড়ীর সাহায্যে হাসনাবাদ পোষ্ট অফিসে নেয়া হত ডাকে ছাড়বার জন্য। মনসিনিয়র মাইকেল ডি কস্তার কথা অনুসারে ফাদার ডেলনী একজন খ্যাতনামা লেখক ও বক্তা ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা এতই প্রখর ছিল যে, তার বিষয় বস্তু মুহূর্ত মধ্যে কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়ে নিতেন। উল্লেখ্য পাকিস্তানের প্রথম দশকে (১৯৪৭-১৯৫৭) বাংলাদেশের রোমান ক্যাথলিকগণ শিক্ষা, চাকরী ব্যবসা ও রাজনীতিতে বিপুল অগ্রগতি অর্জন করেছিলেন বলে সে সময়ের রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীর স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসন মুক্ত হবার পূর্বে তৎকালীন পূর্ব বাংলার রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী সমূহের তত্ত্বাবধান করতেন কলিকাতার আর্চ বিশপ। কিন্তু পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হবার ফলে কলিকাতার আর্চ বিশপের পক্ষে এদেশের রোমান ক্যাথলিকদের পরিচর্যা করা কঠিন হয়ে পড়লে ১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একজন আর্চ বিশপ নিযুক্ত করা হয়। ঢাকা ডায়োসিসের বিশপ, মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের রেভারেন্ড লরেঞ্চ গ্রেনার, সি, এস, সি এই নব সৃষ্টি পদটি প্রথম অলংকৃত করেন। রেভারেন্ড গ্রেনার ত্রিশের দশকে বাংলাদেশে আসেন। প্রথম হতেই তিনি এদেশে শিক্ষা ও খ্রীষ্ট ধর্মের বিস্তারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। আর্চ বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হয়েই রেভারেন্ড গ্রেনার তৎকালীন পূর্ব বাংলার রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে এ দেশে রোমান ক্যাথলিক মিশন সমূহের পরিচালিত যে তেত্রিশটি উচ্চ বিদ্যালয় চালু রয়েছে। ওই সকলের অধিকাংশই প্রাথমিক স্তর হতে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছিল আর্চ বিশপ গ্রেনারের পৃষ্ঠপোষকতায় পঞ্চাশের দশকে ঢাকা শহরে নটরডেম কলেজ ও

Dhaka University Institutional Repository

হলিক্রশ কলেজ নামে দুটি ক্যাথলিক কলেজের গোড়াপত্তনের মূলেও ছিলেন আর্চ বিশপ গ্রেনার। পাকিস্তানি আমলে রোমান ক্যাথলিক মিশন স্কুল ও কলেজ গুলি এদেশে খুব জনপ্রিয় ছিল তবে বর্তমান বাংলাদেশেও যে রোমান ক্যাথলিক মিশন স্কুল ও কলেজ গুলি যে জনপ্রিয় নয় তা নয়। এভাবে বিভিন্ন পর্যায়কে অতিক্রম করে এদেশে রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী শিক্ষা বিস্তারে সোনালী যুগের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

জনসেবামূলক কাজঃ

জনসেবামূলক কার্যের দিক দিয়ে রোমান ক্যাথলিক মন্ডলীর নাম এদেশে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৫১৭ সাল থেকে আরম্ভ করে বৃটিশ যুগ এবং পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে জনসেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, রোমান ক্যাথলিক ফাদার , মাদার , ব্রাদার ও সিষ্টারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্কুল, কলেজ, ফার্মেসী, ও হাসপাতালসমূহ বাংলাদেশের ক্যাথলিকদের মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত সমবায় ঋনদান সমিতি অনেক লোককে উপকৃত করেছিল। উল্লেখ্য, পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন পুর্ব বাংলার চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল মার্কি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া প্রদেশের ক্যাথলিক সিষ্টারদের নেতৃত্বে। ১৯৫২সালে অক্টোবর মাসে ঢাকার মগবাজারে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন বিশাল হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল এর পরিচালনা করতেন সিষ্টারগণ নিজেরাই। সিষ্টারগণ নিজেরাই সবল ও উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করে থাকতেন। কারণ তাঁদের মধ্যেই পাশ করা ডাক্তার, নার্স, ধাত্রী, অভিজ্ঞ ঔষধ

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তুতকারী ঔষধ বিজ্ঞানী এবং পরিচালক রয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ হাসপাতালরুপে বিবেচিত হত। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ রেডক্রশ সোসাইটির পরিচালনায় রয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পর চট্টগ্রাম ডায়োসিসে ক্যানাডার ক্যাথলিক মিশনারীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলাদেশে রোমিও মন্ডলীর পুরাতন ক্ষেত্র সমূহে যথা চট্টগ্রাম, নোয়াখালী বরিশাল ও ফরিদপুর জেলায় তারা নানা সেবামূলক কাজ আরম্ভ করেন।

এদেশে ক্যানাডীয় মিশনারীদের পথিকৃৎব্রাদার ফ্লাভিয়ান ল্যাপল্যান্ট সি. এস . সি. ১৯৪৫ সালে চট্টগ্রামের ফাজিলকার হাটে মিরিয়াম আশ্রম নামে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন। ফাজিলকার হাট প্রাচীন পর্তুগীজদের দিয়াঙ্গা বন্দরে অবস্থিত। ব্রাদার ফ্লাভিয়ানের অক্লান্ত পরিশ্রমে মিরিয়াম আশ্রম এখন এদেশের একটি শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।বর্তমানে এখানে একটি অনাথ আশ্রম, একটি হাইস্কুল, একটি গভীর সমূদ্রে মৎস শিকার প্রকল্প, একটি নারী কল্যান প্রকল্প, একটি হাসপাতাল একটি নার্সিং স্কুল ও একটি গৃহ নির্মাণ প্রকল্প রয়েছে। ব্রাদার ফ্লাভিয়ানের সকর্মীর মধ্যে ব্রাদার মার্সেল ভিক্টোর মার্টিনের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রাদার মার্সেল ক্যানাডার অধিবাসী। তিনি আশ্রমের হাইস্কুলের তত্ত্বাবধান করেন। আর মিঃ ভিক্টোর মার্টিন মিরিয়াম অনাথ আশ্রমেরই একজন প্রাক্তন ছাত্র। স্থানীয় একটি জেলে পরিবারে তার জন্ম। বি, এ পাশ করার পর তিনি আশ্রমেরই নানা কার্যে নিয়োজিত আছেন। হাইস্কুলে শিক্ষকতা করা ছাড়াও মিঃ মার্টিন আশ্রমের ওয়ার্ক শপের তত্ত্বাবধান ও মৎস শিকারে প্রকল্পের পরিচালনা করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

মিরিয়াম আশ্রম টি ব্রাদার ফ্লাভিয়ানের খ্রীষ্টীয় প্রেম, ত্যাগ ও সেবার একটি নিদর্শন। তিনি এখানে সত্তর হাজার গাছ রোপন করেছেন। খ্রীষ্টীয় প্রেমের যে বীজ তিনি এখানে বপন করেছেন তার জন্যই তিনি এদেশের খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। তাছাড়া আশ্রমের নিকটাবর্তী একটি পল্লীতে ওয়াল্টার রোজারিওর বাড়ীতে প্রাচীন পর্তুগীজদের একটি কাষ্ট নির্মিত ম্যাডোনা মুর্তি দেখতে পাওয়া যায় যা এদেশের ক্যাথলিক মন্ডলীকে সেবামূলক কার্যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

আর্চ বিশপ লরেন্স প্রেনারের সময় জন সেবামূলক কার্য আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তৎকালীন পূর্ব বাংলার বিভিন্ন ক্যাথলিক পল্লীতে সমবায় ঋন দান সমিতি গঠন। এই মহৎ কাজটি সম্পাদন করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই আর একজন ক্যাথলিক মিশনারী ফাদার চার্লস ইয়ং। আর্চ বিশপ গ্রেনারের কার্যকাল (১৯৫০-১৯৬৭)। ফাদার ইয়ং বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ঋন দান সমিতি আন্দোলনের অগ্রদূত। ধান চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থাপনা করেছেন। মহাজনদের কবল হতে রক্ষার জন্য তিনি লোকদের অর্থ সমবায়ের মধ্যে দিয়ে সঞ্চয় করা পরামর্শ দিয়েছেন। সম্প্রীতি ঢাকার খ্রীষ্টান ঋনদান সমিতি তাঁর দীর্ঘ দিনের কর্ম প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরুপ তাঁকে স্বর্ণ পদকে সম্মানিত করেন। ফাদার ইয়ং ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের সামাজিক কার্যক্রমের প্রথম পরিচালক।[১০]

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে যে রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক কার্যের পাশাপাশি জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন করে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে রেখে গেছেন এক অম্লান কির্তী।

নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন

শিক্ষা ও জনসেবামূলক কাজ

খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে গিয়ে নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন চাঁদপুর ও ব্রাহ্মন বাড়ীয়া জেলায় কয়েকটি স্কুল নির্মাণ করেছিল। মিস এম্মা বেকিংসেল হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কয়েক জন খ্রীষ্টান মহিলাকে প্রশিক্ষন দিয়েছিলেন। যার ফলে ব্রাহ্মন বাড়ীয়ায় মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে কিছু সংখ্যক মহিলা শিক্ষার আলো পেয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের নেতৃত্বে চাঁদপুর ও ব্রাহ্মন্নবাড়ীয়া জেলায় শিক্ষামূলক কর্মসূচী গৃহীত হলে উক্ত জেলাসমুহে শিক্ষার প্রসার হয়েছিল।

জনসেবার দিক দিয়ে নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের কাজ স্মরণীয় হয়ে আছে। রেভারেন্ড টেকলের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মন্ন বাড়ীয়ায় বিভিন্ন ডিসপেনসারী, স্কুল এবং মিস বেকিংসেল ব্রাহ্মন্নবাড়ীয়ায় দুঃস্থ মহিলাদের জন্য বিধবা শ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিংশ শতকে ডাঃ চালর্স নর্থ এর প্রচেষ্টায় চাঁদপুরে সর্বাধিক আধুনিক ব্যাপ্টিষ্ট মিশন হাসপাতাল নির্মিত হয়। বিংশ শতকের প্রথম দশকে তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলায় এই সর্ববৃহৎ আধুনিক হাসপাতালের ছিল দুটি ওয়ার্ড প্রত্যেকটিতে দশটি করে বেড দুটি বিশেষ ওয়ার্ড, প্রত্যেকটিতে দুটি করে বেড একটি অপারেশন রুম এবং তিনটি বিশাল বারান্দা। এই হাসপাতালের শিশু ও মহিলা ওয়ার্ডের নাম দেয়া হয়েছিল মেরী এলি ওয়ার্ড। হাসপাতালের কাজ শেষ হবার সাথে সাথে ডাঃ নর্থ এর পাশে একটি অতি সুন্দর উপাসনা মন্দির ও একটি ডিসপেনসারী নির্মাণ করেছিলেন চাঁদপুরে ডাঃ চালর্স নর্থ প্রায় নয় বছর মিশন হাসপাতাল ও তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

১৯০৫ সালে অকল্যান্ডের ক্যাপ্টেন স্মিথ ডাঃ নর্থকে একটি মটর লঞ্চ দান করেন। এই মটর লঞ্চটির নাম দেয়া হয়েছিল দয়ামনি চাঁদপুরের মেঘনা ও এর অসংখ্য শাখা প্রশাখায় দয়ামনি ছিল বহু বছর ধরে। ডাঃ নর্থ ও তার উত্তরসূরী এবং খ্রীষ্ট ধর্মের অন্যান্য প্রচারকদের বিশ্বস্ত বাহন। অবশ্য পরবর্তীতে এর স্থান দখল করে নিয়েছিল নিউজিল্যান্ডের Young women's Bible classes এর দানে কেনা হাউজ বোট শান্তিদূত।[১১] এভাবে নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ধর্মীয়, শিক্ষামূলক এবং সর্বোপরি জনসেবামূলক কাজে এদেশের মানুষের নিকট খ্রীষ্টের শান্তির দূত হিসাবে কাজ করে গিয়েছে। যার ফলে শুধু নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন নয় অক্সফোর্ড মিশনের প্রশংসিত কাজে খুশী হয়ে পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপজাতিয় লোক থেকে আরম্ভ করে অবস্থাপন্ন ঘরের লোকেরা খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলে পরবর্তী সময়ে অক্সফোর্ড ও নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের কাজের সাফল্যের সূত্র ধরে আরো অনেক খ্রীষ্টান মিশনারীগণ দল এদেশে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে এগিয়ে এসেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্ট্রেলিয়ান , অক্সফোর্ড, ইংলিশ প্রেসবিটারীয়ান ও ওয়েলশ প্রেস বিটারীয় মন্ডলীর শিক্ষা ও জনসেবামূলক কার্যাবলীঃ

অক্সফোর্ড মিশনের মিস আর্নল্ডের প্রচেষ্ঠায় পাবনার সানডে স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ওয়েলশ প্রেসবিটারীয়ান মিশনের সি, টি আলেকজন্ডার চিকনা গোলের খ্রীষ্টান জনগণের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ঠ মনোযোগী ছিলেন বিধায় শিক্ষার আলো জ্বলে উঠেছিল তাছাড়া অক্সফোর্ড মিশনের নেতৃত্বে ঢাকা ও বরিশাল জেলায় শিক্ষামূলক কাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। ইংলিশ প্রেস বিটারীয়ান মিশনের রেভারেন্ড সিংহ রাজশাহী এসে সর্ব প্রথম পাঠশালা খুললে শিক্ষার আলো প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীপর্যায়ে এ সকল খ্রীষ্টান মিশনগুলোর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়লে অনেকেই শিক্ষিত হয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।

ইংলিশ প্রেসবিটারীয়ান মিশনের ডাঃ মরিশন কর্তৃক রাজশাহীতে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করে রোগীদের সেবা করেছিলেন। উল্লেখ্য, অক্সফোর্ড মিশনের সিষ্টারগণ বিভিন্ন সমাজ কল্যান কার্যে অংশগ্রহণ করতেন। তারা খ্রীষ্টান মহিলাদের মধ্যে পালকীয় ও শিক্ষা বিস্তারের কাজ এবং আর্তপীড়িতদের চিকিৎসা করতেন। তারা দুঃস্থ মানুষের সেবার জন্য সিলেটে একটি ফার্মেসী নির্মাণ করেছিল। জনকল্যানের দিক দিয়ে অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট মিশন অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছিল। ১৯১১ সালে এই মিশন কর্তৃক পাবনায় John price House নির্মিত হলে দুঃস্থ মহিলারা সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তাছাড়া কুমিল্লা পাবনা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে বহু ডিসপেনসারী খোলা হলে আর্ত পীড়িতদের মধ্যে সেবামূলক কার্য স্মরণীয় হয়ে আছে। মিসেট টাকের চেষ্টায় ফরিদপুরে বিধবা শ্রম স্থাপিত হলে অক্সফোর্ড মিশনের সেবামূলক কার্য সার্থক হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটিকাসমূহ

১। নোয়াখালী খ্রীষ্ট মন্ডলীর ইতিহাস
১৫০০-১৯৫০
ফাঃ আরতুরো স্পেজিয়ালে পিমে.
পৃঃ ৯৩-৯৪।

২। দীপ্ত সাক্ষ্য
বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে খ্রীষ্টান
সমাজের অবদান
ফাঃ বার্ণাড পালমা, ডিসেম্বর ১৯৯০
পৃঃ ৩-৪।

৩। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
রেভাঃ প্রিয় কুমার বারুই
পৃঃ ৯৯-১০৪।

৪। Glimpses of Bogra
Viola G, Hershey
p-64

৫। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
পৃঃ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৬। বঙ্গীয় খ্রীষ্টান মন্ডলীর ইতিহাস
রেভাঃ প্রিয় কুমার বারুই
পৃঃ১৮৩

৭। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
পৃঃ৭৬-৭৮

৮। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
পৃঃ ১৬০

৯। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
পৃঃ১৫২

১০। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
পৃঃ১০৬-১১৬

১১। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
পৃঃ১০৬-১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অবদানের ব্যাপ্তি ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়া।

গোটা মানব জীবনের বহিঃ প্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতি। অর্থাৎ সামাজিক মানুষের ধর্মকে কেন্দ্র করে যে সকল আচার অনুষ্ঠান ও রীতি নীতি গড়ে উঠে তার নামই হচ্ছে সংস্কৃতি।

তাই জীবন সম্পৃক্ত, বস্তু সংলগ্ন এবং মানস সম্ভূত এই সংস্কৃতির সাথে ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সুতরাং ধর্ম মানব সংস্কৃতির একটি অবিভাজ্য ও অপরিত্যাজ্য বিষয়। সংস্কৃতি একদিকে যেমন ধর্মীয় জীবনকে প্রভাাবিত করে তেমনি অন্যদিকে নিজেই ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধর্ম তার মূল্যবোধ দ্বারা সংস্কৃতিকে বিবর্তিত করে যাতে সংস্কৃতি আরও মানবীয় হয়ে উঠে।

প্রায় চারশত বৎসর পূর্বে খ্রীষ্ট ধর্ম এই দেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রবিষ্ট হয়েছে। অন্যান্য ধর্মে যেমন তেমনি খ্রীষ্ট ধর্মে এদেশের সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে। আবার এ দেশে প্রবিষ্ট হয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম ও উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় অবদান রেখেছে আর এ অবদানের মূলে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের এক অনন্য ভুমিকাই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও মূল্যবোধে ঃ

শিক্ষা ব্যাতীত কোন জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারেনা। শিক্ষাই জাতির উন্নতির চাবিকাঠি। এই নিগুর সত্যের উপলব্ধি ছিল খ্রীষ্টান ধর্মে। তাছাড়া আবহমানকাল ধরে খ্রীষ্টানদের মধ্যে একটি মূল্যবোধ প্রকট ভাবে কাজ করছিল আর সেই মূল্যবোধ হচ্ছে যেখানে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার সেখানে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়া। এই মূল্যবোধের নীতি নিয়েই ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের রেভারেন্ড সামার্স ১৯০৮ সালে দিনাজপুরে কার্যভার গ্রহণ করে সেখানকার লোকদের সাওঁতালী ভাষা শিখে অনেক সাঁওতালের নিকট খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে সামার্স লিখেছেন যে, একজন সাওঁতাল যুবক অবগাহিত হয়ে কোন একটি গ্রামে যাবার পূর্বে আমার নিকট সু-সমাচার চাইলে আমি তাকে ১২০ টি সু-সমাচার দিলাম। দুমাস পরে সে আরও পুস্তকের জন্য আসল কিছুদিন পরে জানতে পারলাম যে, তারই কার্যের ফলে এই গ্রামের লোকেরা ধর্ম তত্ত্বানেষণ করতেছে।[১]

''খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার ফলে সাওঁতালদের জীবন যাত্রায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। অজ্ঞ সাওঁতালগণ শিক্ষার আলো দেখতে পায়। খ্রীষ্টীয় আদর্শ তাদেরকে বহু সামাজিক কুসংস্কার হতে মুক্ত করলে তাদের মধ্যে তখন আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠেছিল।[২] খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ এমনভাবে শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিল যে তাতে ১৯১০ সালে গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি গ্রামের এক অবহেলিত জনপদ নমঃ শূদ্রগণ সামাজিক অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে তাদের সামাজিক আন্দোলনে অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের মিস টাকের নিকট সাহায্য কামনা করেছিল। মিস টাক তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওড়াকান্দিতে একটি নতুন মিশন কেন্দ্র খুলেছিলেন। ওড়াকান্দিতে তখন নমঃশূদ্র জাতির এক ধর্ম নেতা বাস করতেন। তিনি মিস টাকের সহকর্মী ডাক্তার মিডকে বলেছিলেন যে, ''আপনারা এখানে কার্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আমাদের বিধাবাগণই আমাদের সমাজের কলংকস্বরুপ, তাদের গৃহগুলি বেশ্যালয় সদৃশ; আপনারা যদি এসে তাদের উদ্ধারের নিমিত্তে কিছু করতে পারেন তো নিশ্চয় এসে করতে পারেন।'' [৩]

মিস টাক এই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন নি। সেই সময় হতে তার মিশনারী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওড়াকান্দির বিধবাদের প্রতি খ্রীষ্টায় প্রেমও আদর্শ প্রচার করে যান। তারই প্রচেষ্টায় বিধবাদের আশ্রয় দিবার নিমিত্তে ওড়াকান্দিতে গঠিত হয়েছিল ''ওড়াকান্দি বিধবাশ্রম'' বিশ্বের খ্রীষ্টানদের বাংলাদেশের নমঃশূদ্র বিধবাদের ব্যাপারে দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে "Contact"নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন। মিস টাকের খ্রীষ্টীয় প্রেম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে কিছু কালের মধ্যেই ওড়াকান্দি বিধবা আশ্রয় বিধবাদের দ্বারা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

আশ্রমবাসী মহিলাদের মধ্যে অনেকে যীশু খ্রীষ্টকে মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করলে ওড়াকান্দিতে একটি ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী স্থাপিত হয়েছিল।

মিস টাকের যত্ন ও সুশিক্ষার ফলে বিধবারা সুখী ও সুন্দর জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। যে মহিলাটি প্রথম এই আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন,

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে তিনি অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের ''সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও কার্যকুশল প্রচারিকা '' বলে গণ্য হয়েছিলেন।[৪]

উদ্ধার প্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টান পরিবারের মধ্যে স্ত্রী অথবা মাতারুপে সুখে জীবন অতিবাহিত করেছেন; আবার অনেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেবিকারুপে আর্ত মানুষের সেবা করেছেন; আবার কেহ কেহ শিক্ষাকতা অথবা সু-সমাচার প্রচার কাজে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ করে খ্রীষ্ট নাম প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।[৫]

অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ওড়াকান্দিতে বিধবাশ্রম ছাড়াও একটি হাই স্কুল ও স্থাপন করেছিল কিন্তু এই সকল সমাজকল্যাণ কাজ সত্ত্বেও এই অঞ্চলে খ্রীষ্টের রাজ্য বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করতে পারেনি ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দিতে নমঃশূদ্রদের মধ্যে ডাঃ মিড আপ্রান চেষ্টা করেছিলেন তাদের কে খ্রীষ্ট ধর্মে দিক্ষীত করতে। এ কার্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ও হয়েছিল কিন্তু ২/৪ টি হিন্দু-মুসলিম পরিবার ও কয়েকজন বিধবা ব্যতীত আর কেউ খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেনি।

অষ্ট্রেলিয়ার ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের মিশনারী ফরিদপুর ও পাবনা জেলায় খ্রীষ্ট ধর্ম বিস্তারে কঠোর পরিশ্রম করেও বিশেষ ফল লাভ করতে না পারলে ও গারো পাহাড় অঞ্চলে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে যথেষ্ঠ সফল হয়েছিল।

উপরিউক্ত আলোচনার কয়েকটি খন্ড ঘটনার আলোকে এটাই পষ্ট হয়ে উঠে যে, বিংশ শতকে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের দ্বারা ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় খ্রীষ্টীয় শিক্ষা প্রচারের ফলে সফলতা কোন কোন ক্ষেত্রে বিফলতার পাশাপাশির মধ্যে দিয়ে এই দেশের মানুষের মধ্যে মুক্ত চিন্তার সূচনা করেছিল। মিশনারীদের

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রম কে কেন্দ্র করে নতুন ভাবধারার সৃষ্টি হয়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের ফলে ইউরোপিয় ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান ও দর্শন ভাবধারা ও মূল্যবোধের সাথে এ দেশের অনেক জ্ঞানী মনীষী, বুদ্ধিজীবি ও সমাজ সংস্কারকদের পরিচয় ঘটেছে। এ কারণে এ দেশের মানুষ শিক্ষা ও মূল্যবেধের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের নিকট অনেক খানি ঋনী''

ভাষা ও সাহিত্যে অবদানঃ

ভাষা ও সাহিত্যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারাদের অবদান লক্ষনীয়। ভাষা সাহিত্যকে উন্নতি ও উৎকর্ষ দান করে থাকে। খ্রীষ্ট বিশ্বাস ব্যাখ্যা ও শিক্ষা দেয়ার জন্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলায় কয়েকখানা ''কাটি খিজম'' বা ধর্ম শিক্ষা পুস্তক রচনাকরেছিলেন ''ব্রাহ্মন রোমান কাথলিক সংবাদ'' নামক পুস্তকটির রচয়িতা ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র আন্তইন ডি, রোজারিও (১৬৬০)। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারিতে স্থান দখল করায় এর যথেষ্ঠ অবদান লক্ষ করা হয়। তাছাড়া ফাঃ মানুয়েল দ্য আসুম্প সাঁ ও রোমান হরফে বাংলা ''কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'' এবং বাংলা ব্যাকরণ ও পর্তুগীজ বাংলা শব্দ কোষ দুটি রচনা করে এক অম্লান কীর্তি রেখে যান। রোমান হরফে ছাপা দ্বিতীয় পুস্কটি বাংলা ভাষার এক নতুন ইতিহাস এবং মুদ্রিত বাংলা সাহিত্যের পূর্বলগ্নে এক অভিনব প্রস্তুতি ।[৬]

বাংলা ভাষার গদ্য রচনা ছিল খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অবদানের একটি অন্যতম প্রধান কীর্তি।রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরী যদিও বাংলা গদ্য সাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

জনক ছিলেন তথাপি পরবর্তী সময়ে অনেক খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডোমিনিক দ্য সুজা যিনি ফাদার ফার্নান্ডেজ রচিত পর্তুগীজ ভাষায় ''খ্রীষ্ট ধর্মের মুলনীতি'' ও একটি প্রশ্নোত্তর মালা গ্রন্থগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্ত রচনা করেছিলেন। বিংশ শতকের ১৯২৮ সালে ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের সু-সাহিত্যিক রেভারেন্ড অমৃত লাল সরকার কর্তৃক রচিত '' ভারত বন্ধু ডাঃ উইলিয়াম কেরী '' সু-সমাচার চতুষ্টয় '' ''প্রেরিতদের কার্যবিবরন'' ''খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস '' ইত্যাদি গ্রন্থ এবং রেভারেন্ড ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস কর্তৃক বিংশ শতকের ১৯৪২ সালে রচিত ''বঙ্গে যীশুর বিজয় যাত্রা '' (১৭৯২- ১৯৪২) নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নির্দশন। শুধূ উপরিউক্ত লেখকগণই নয় আরো অনেক খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক বাংলা সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে অম্লান হয়ে রয়েছেন। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে '' ১৯৩৬ সাল ছিল একটি স্মরণীয় বছর ।এই বছরের জুলাই মাসে বাংলা দেশের প্রথম খ্রীষ্টীয় পত্রিকা ''নবযুগ'' চাঁদপুর হতে আত্মপ্রকাশ করে। উল্লেখ্য, বৃটিশ যুগে বাংলা ভাষায় খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল পশ্চিম বাংলার শ্রীরামপুর ও কলিকাতা। বাংলাদেশে অনেক খ্রীষ্টান সাহিত্যিক থাকা সত্ত্বেও এদেশে তাদের সাহিত্য চর্চার কোন মাধ্যম ছিলনা। ''নবযুগ '' তাই এক নবযুগের সূত্রপাত করেছিল। এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল ''এই পত্রিকার উদ্দেশ্য এই যেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্মতত্ত্ব এবং তৎসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করতে পারা যায়। ''পত্রিকাটি তৎকালীন পূর্ববঙ্গে নিউজিলান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের সর্বশ্রেষ্ট কীর্তি।

Dhaka University Institutional Repository

রেভারেন্ড বি, এন, হুউ এর প্রথম সম্পাদক। পরবর্তীকালের বাংলাদেশের ক্যাথলিক পত্রিকা ''প্রতিবেশী'' এবং এ্যাংলিকান পত্রিকা''সুহৃদ সংবাদের '' পথিকৃৎ ছিল এই নবযুগ।[৭]

যাই হোক, পরবর্তী সময়ে এদেশের খ্রীষ্টান লিখিয়েরা গ্রন্থ প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা -নাটক বিন্যাসের মাধ্যমে সমাজচিত্র ধর্মশিক্ষাও ধর্মতত্ত্ব রচনা করেছেন বাংলা ভাষায়। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্টীর কাছে এ সাহিত্য না পৌছঁলেও বাংলা সাহিত্যে এগুলোর বিশেষ ভুমিকা রয়েছে।

ধর্ম ও ঐতিহ্যে অবদানঃ

''বিচিত্র শ্রেণী বৈষম্যে প্রভাবিত বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে খ্রীষ্ট ধর্মের আগমন ঘটে। খ্রীষ্টানদের শিক্ষা সমাজ সংস্কার ও সেবা কার্যের মধ্যে দিয়ে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি আরেকটি ধর্ম ও তার ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের সাথে পরিচিত হয়েছে। সকল শ্রেণী বৈষম্যের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে ক্ষমা ও প্রেম, মিলন ও শান্তির বাণী। খ্রীষ্টানদের মূল্যবোধসমূহ বিবাহ ও পারিবারিক জীবন, নৈতিক জীবন, ব্যক্তিগত প্রার্থনা , পারিবারিক প্রার্থনা ও সমবেত প্রার্থনার জীবন, ধর্মপ্রান ব্যক্তিদের ত্যাগ ও সেবার আদর্শ, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের জীবন-সাধনা, খ্রীষ্টান সমাজে সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা, কল্যাণ ও সমাজবোধ, মানব ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রভৃতি মূল্যবোধসমূহ এদেশের সংস্কৃতিকে আরো মানবিক করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

মানব উন্নয়ন ও মানবসেবায় অবদানঃ

সেবা কাজের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ প্রকাশ করেছেন তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও পালন করেছেন বিধাতার দেয়া প্রেমের আজ্ঞা। শুধু মানবতাবোধ নয়, ধর্ম বোধই খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদিগকে অনুপ্রাণীত করেছে এদেশের মানুষের সেবা কাজে আত্মনিয়োগ করতে। মানুষকে ভাল বাসার মধ্য দিয়েই তারা বিধাতাকে ভালোবাসতে চেষ্টা করে এবং মানুষের কাছে বিধাতার ভালবাসা পৌঁছে দেয়। প্রেম ও সেবার এই জীবন চর্চা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে এক নতুন মূল্যবোধের দ্বারা রুপান্তরিত করেছে।

খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণের এই মানব প্রেমের ইতিহাস অধ্যায়ন করলে দেখা যায় যে বিগত চারশত বছরে তাঁরা বিভিন্ন দয়া ও সেবা কাজের মধ্যে অসুস্থ্যদের চিকিৎসা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনাথদের রক্ষা, কুষ্টদের সেবা, মৃত্যুদ্বারে উপনীত অথচ পরিত্যক্ত পুরুষ নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সেবা ইত্যাদি পালন করে অমর হয়ে রয়েছেন। সেবার উদ্দেশ্য দেশে বিভিন্ন জায়গায় খ্রীষ্টান এলাকাগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতাল এবং শিশু, অনাথ বিধবা ও কুষ্টদের আশ্রম।[৯]

বিংশ শতকে ক্যাথলিক মন্ডলীর দ্বারা স্থাপিত বর্তমানের হলি ফ্যামিলী হাসপাতাল, হলিফ্যামিলী স্কুল, নটরডেম স্কুল ছাড়া ইংলিশ প্রেসবিটারীয় মন্ডলীর ডাক্তার ম্যাকডোনাল্ডস্মিথ ও তার স্ত্রী এবং ডাঃ মরিসন কর্তৃক মিশন হাসপতাল খ্রীষ্টীয় প্রেম ও সেবার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। যদিও খ্রীষ্টীয় প্রেমের উদাহরণস্বরুপ এ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আরো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,মিশন হাসপাতাল ও

Dhaka University Institutional Repository

অনাথ শ্রম রয়েছে তথাপি এ আলোচনার সংক্ষেপে এবং সুবিধার্থে মাত্র কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা করা হয়েছে।

সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বহু সমবায় ও সঞ্চয় সমিতি গঠনে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কেননা মানব প্রেম ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মে ঈশ্বরের প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। তাই এদেশের আর্ত পীড়িত মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ রেখে গেছেন তাদের সেবা কাজের এক অম্লান ইতিহাস।

লোক সংস্কৃতিতে অবদান ঃ

খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণের ভাব-চিন্তা, আচার-আচরন, আহার-সামগ্রী, পালা পার্বন, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, জীবন পদ্ধতি, উৎসবাদী, সমাজের রীতিনীতি, নিয়মাবলী, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি ঘিরে যে সংস্কৃতি লোকায়াতে বিরাজ করছে তা সম্পুর্ণ অবিমিশ্র লোক -সংস্কৃতি না হলেও তাতে রয়েছে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। দেশীয় লোক সংস্কৃতি খ্রীষ্টাদর্শের পরশ পেয়ে খ্রীষ্টানদের নিজস্ব ভাবমূর্তি প্রকাশ করছে। একই কথা লোক সংগীতের বেলায় ও খাটে। বাউল, লালন শাহ ফকির, হাসান রাজা, কালু সাহা, নিমাই সন্নাস প্রমূখ ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিকতায় পূষ্ট হয়ে প্রিয়নাথ বৈরাগী রচনা করেছিলেন ''সেবক সমিতি '' যা বাংলা সঙ্গীতে এক অপূর্ব সংযোজন বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আখ্যায়িত করেছিলেন। বরিশাল,ফরিদপুর, ও খুলনা অঞ্চলের খ্রীষ্টানদের মধ্যে ''সেবক সঙ্গীত'' আজও জনপ্রিয় হয়ে বহুল প্রচলিত । তাছাড়া খ্রীষ্ট ধর্ম ও তার ঐতিহ্যের প্রভাবে রচিত পালাগান, যীশুখ্রীষ্টের

Dhaka University Institutional Repository

''কষ্টের গীত'' পদাবলী কীর্ত্তন ও সংকীর্তন, বৈঠকী গান, কবিগান প্রভৃতি লোক সঙ্গীত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে পরিবশিত হয়ে থাকে আর এ সকল গানের প্রর্বতক ছিলেন বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক।[১০]

১৯১১ সালে আচার্য উইলিয়াম কেরী কর্তৃক সংকলিত-ধর্মগীত (নতুন সংস্করণ) বিশেষ আদৃত হয়েছিল বর্তমানেও কোন মন্ডলীর উপাসনালয়ে ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খ্রীষ্টীয় মন্ডলীগুলো গ্রামাঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত এবং খ্রীষ্টীয় জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ অশিক্ষিত ও সামান্য শিক্ষিত গ্রাম্য নর/নারী। সমগ্র বাংলাদেশের খ্রীষ্টীয় জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বরিশাল ও ফদিরপুরের বাসিন্দা। এদের উপযোগী ও প্রানস্পর্শী গান ধর্মসঙ্গীতগুলিতে খুবই কম ছিল। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আচার্য প্রিয়নাথ বৈরাগী এদের এই অভাববোধ করে ভাটিয়ালী সুরে বহু পল্লীগীত রচনা করেন এবং সেবক সমিতির মাধ্যমে এ সকল প্রচলন করেছিলেন।[১১]

এ সকল সঙ্গীতের মাধ্যমে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা করা হতো এবং ধর্ম প্রচারকগণ সফল ও হতেন অনেকাংশে।

''নাট্যকলায় ও খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণের বেশ অবদান রয়েছে। ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে নাটক রচনা ও মঞ্চায়নে খ্রীষ্টানগণ বহুদিন ধরে জড়িত। কোন

Dhaka University Institutional Repository

কোন মহোৎসবে বাঙ্গালী ও আদিবাসী খ্রীষ্টান উভয়েরই মধ্যে ভক্তিমূলক নৃত্য উপাসনায় অনুষ্ঠিত হবার রীতি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উনবিংশ শতকের শেষার্ধে রেভারেন্ড জেমস লং এবং রেভারেন্ড উইলিয়াম মর্টন প্রমূখ মিশনারীগণ খ্রীষ্টের বাণী প্রচারনায় এদেশের জনগণের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য লোক জীবনের তথ্য সংগ্রহে যে উদ্যোগ ও সফলতা দেখিয়েছেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মোট কথা, বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতিকে বিশেষ করে লোকাচার, লোক-সংস্কার, লোকচিত্র, লোক উপকরণ, লোকবাদ্য, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য প্রভৃতি উপাসনা এবং ধর্মীয় সংস্কার উৎসব ও অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে এ সবের প্রতিযোগ্য মূল্য ও মর্যাদা দিচ্ছে । এভাবে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ একদিকে বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির উন্নতি ও বিকাশ সাধন করেছেন এবং অন্যদিকে সেই সংস্কৃতিকে ঐতিহ্যবাহী করে সংরক্ষন করে গিয়েছেন।

উপরে উল্লেখিত আলোচনার আলোকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের অবদান পরিস্ফুট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকগণ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সাথে এদেশের সংস্কৃতির সম্মিলনের মুখামুখি এর মধ্য দিয়ে তাদের অবদানের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন। শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যে, ধর্ম ও ঐতিহ্যে মানব উন্নয়ন ও মানব সেবায় এবং লোক সংস্কৃতিতে অম্লান অবদানের মধ্যে দিয়ে এদেশে ঐ সকল খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদিগের আগমনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যারা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসে এদেশের সংস্কৃতির সাথে ইউরোপীয় সংস্কৃতির পরিচয় ঘটিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। আর এর ফলস্বরুপ স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। স্থানীয় প্রতিক্রিয়ায় এদেশের সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সম্মিলনের ফলাফল ছিল ইতিবাচক।

প্রতিরোধ,স্থানীয় প্রতিক্রিয়া ঃ

খ্রীষ্ট ধর্ম এদেশে প্রচারের ক্রান্তি লগ্ন থেকেই এখানকার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে এক নতুন অধ্যায় সংযোজনের যাত্রায়,সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে এর ব্যাপ্তি প্রকাশ করেছিল বিভিন্ন মাত্রায়।

অর্থাৎ বিংশ শতকের বাংলার এই ধর্মটির বিকাশের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়েছিল লক্ষ্যণীয় কিছু স্থানীয় প্রতিক্রিয়া।

উল্লেখ্য, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্পর্শে বাংলায় যে ''নবজাগরণ'' এর উন্মেষ ঘটেছিল বিংশ শতকে এর ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আরম্ভ করে মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন পূর্ব বাংলার অনেক অঞ্চলেই বিভিন্ন মিশনারিগণ শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে ছিলেন সচেষ্ট আর তাদের কর্ম তৎপরতার মাধ্যমেই বাংলার হিন্দু সমাজে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি দেশীয় ভাষার মাধ্যমেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ মনে করতেন যে, ধর্মান্তরের ক্ষেত্র হিসাবে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু সমাজই বেশি উপযোগী।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ, অতীতে হিন্দু সমাজ থেকে বহু লোক ভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাই খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের তৎপরতা হিন্দু ও পাহাড়ী এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ফলে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে হিন্দু ও পাহাড়ী লোকরাই ছিল বেশি। মুসলমান এলাকায় তাদের কর্মতৎপরতা ছিল আগ্রহবর্জিত সীমিত আকারের এবং বিলম্বিত। তাই দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে হিন্দু ও পাহাড়ী উপজাতি যেমন অজ্ঞ সাওঁতাল, কুকি ও গারোদের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক ধর্মান্তরের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন।

ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীগণ দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, বরিশাল ও ফরিদপুর, ঢাকা, যশোহর খুলনা রংপুর জেলায় বিংশ শতকের গোড়াতে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টের রাজ্য বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ময়মনসিংহের গারো, দিনাজপুরের সাঁওতাল উপজাতিরা তখন খ্রীষ্টান ধর্মের সংস্পর্শে আসাতে বাধ্য হয়। আর তা সম্ভব হয়েছিল ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের মিশনারীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, ''বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাপ্টিষ্টগণ সু-সমাচার প্রচার, শিক্ষা বিস্তার ও সেবা কাজে অন্যান্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগামী। ব্যাপ্টিষ্টদের এই অগ্রযাত্রার মূলে রয়েছে উন বিংশ শতকের ব্যাপ্টষ্টদের ত্যাগ, প্রার্থনা, পরিশ্রম ও ব্যাক্তিত্ব।''[১২]

উল্লেখ্য, ইংলিশ ব্যাপ্টষ্ট মিশনের এই দেশে ধর্ম প্রচারের সফলতার সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন মিশনসমূহ বাংলাদেশে আসতে থাকে। এইসকল মিশনসমূহের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ান ব্যপ্টিষ্ট মিশন, অক্সফোর্ড মিশন, ওয়েলশ্

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসবিটারীয়ান মিশন, ইংলিস প্রেসবিটারীয়ান মিশন, চার্চেজ অব গড় মিশন ও নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন এবং আরও অনেক মিশনসমূহ প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব থেকে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় ও পাহাড়ী অঞ্চলের উপজাতি এলাকায় সফলতা ও বিফলতার মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে তৎপর ছিল। ফলে কোন কোন অঞ্চলের মানুষ খ্রীষ্টান ধর্মের সংস্পর্শে এসে পূণরায় তাদের সনাতন ধর্মে ফিরে যেতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। স্থানীয় লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় আদর্শ প্রচারের ফলে বেশ কয়েকটি উপজাতি ও মুসলমান পরিবার খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। যে সকল মুসলমান খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন মৌলভীও ছিলেন। রেভারেন্ড হ্যামিলটন এই মৌলভী সাহেব কে প্রেসবিটারীয় মন্ডলীর মুন্ডমালা শাখার পালকরুপে অভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু নুতন সংস্কৃতি নিয়ে আগত এই ধর্মটির প্রতি বিরুপ প্রতিক্রিয়া স্বরুপ মৌলভী সাহেব পালকের কাজ ছেড়ে দিয়ে পূণরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে গিয়েছিলেন। পালকের দেখা দেখি অন্যরাও খ্রীষ্টীয় মন্ডলী ত্যাগ করেছিল। এর ফলে ইংলিশ প্রেসবিটারীয় মিশনের মুন্ডমালা অঞ্চলে স_সমাচার প্রচারের কাজই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধুকি তাই? পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিক্রিয়া স্বরুপ উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা সম্পূর্নরূপে দূরিভুত হতে পারেনি। বিংশ শতকে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ফলে জাতীয়তাবোধ জেগে উঠেছিল। ইংরেজী শিক্ষার মূলে খ্রীষ্টীয় আদর্শ থাকলে ও বাংলাদেশের উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের জাতীয়তাবোধ হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামী হতে মুক্ত ছিলনা। এর ফলে হিন্দু-সমাজের জাতীয়তাবোধ হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটাতে পারেনি। তাই নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা বিশেষত নমঃশূদ্র শ্রেণীর লোকেরা প্রথম দিকে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেও গোটা নমঃশূদ্র শ্রেণীর হিন্দুগণ কখনই খ্রীষ্টান ধর্মে

Dhaka University Institutional Repository

আকৃষ্ট হয়নি। যদিও নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের রেভারেন্ড পিটার ম্যাকনী তার Crucial Issues in Bangladesh নামক বিখ্যাত গ্রন্থে দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নমঃশূদ্র জাতিকে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি সবচেয়ে বেশি আগ্রহী শ্রেণী বলে দেখিয়েছেন। তাই দেখা যায় অষ্ট্রেলিয়ান মিশনের মিস বার্থা টাকের প্রচেষ্টার ফলস্বরুপ গোপালগঞ্জ মহকুমার ওড়াকান্দি গ্রামের নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে কয়েকজন অনাথ বিধবার খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ।

শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে খ্রীষ্টাধর্ম প্রচার কোন কোন ক্ষেত্রে বিফল হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সফল হয়েছিল।

খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আধূনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্ত্রী শিক্ষার ও প্রসার ঘটিয়েছিল।

উল্লেখ্য, উনিশ শতকে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার বিস্তার কতিপয় সুনির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি সব সময় সময়ের ক্রমানুসারে ঘটেনি। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ এ ব্যাপারে অগ্রদূত ছিলেন। তাঁরা উপনিবেশের সর্বত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তর করা। এই সময় ছাত্রীরা সমাজের নিম্নস্তর থেকে এসেছিল, কেননা কোন "উচ্চবিত্ত" তাদের বাড়ীর কোন বালিকাকে এই ধরণের স্কুলে পাঠাতে প্রস্তুত ছিলনা। এই দেশের নিম্নস্তরের নারীগণ, অনাথ-বিধবা এরা মিশনারীদের স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসংস্থানের জন্যে। ফলে উনবিংশ এবং বিংশ শতকে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষা বৃদ্ধি পেলে অবহেলিত নারী সমাজ উন্নতির দিকে এগিয়ে এসেছিল। এভাবে এদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের কর্ম কান্ডের মধ্য দিয়ে যে স্থানীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক। সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের এরুপ অবদানকে লক্ষ্য করে দেশের বিশিষ্ট মৌলভী শ্রেণী প্রতিরোধ গড়ে তুললে ও তা সফল হতে পারেনি বিধায় মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, হিন্দু সমাজের শাখায় সতী দাহ প্রথা উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, নারী শিক্ষা প্রসার, দেশের আর্থ- সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি সমাজের উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের অবদানের ইতিবাচক ব্যাপ্তিকেই তুলে ধরে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা সমূহ

১। কে.দাস, পৃঃ ৪০

২। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত
পৃঃ ৬০

৩। ভারতীয় খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর নেতা ও অগ্রদূতগণ
রেভারেন্ড ডি, এ,চৌধুরী
পৃঃ ৬০

৪। ঐ

৫। ঐ
পৃঃ ৬৫

৬। দীপ্ত সাক্ষ্য
বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে খ্রীষ্টান সমাজের অবদান
ফাঃ বার্নাড পালমা
ডিসেম্বর- ১৯৯০
পৃঃ ৩

Dhaka University Institutional Repository

৭। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস

প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত

পৃঃ১৬৭

দীপ্ত সাক্ষ্য

৮। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে খ্রীষ্টান সমাজের অবদান

ফাঃ বার্ণাড পালমা

১৬শ বর্ষ, ডিসেম্বর-১৯৯০, পৃঃ৪

৯। ঐ

পৃঃ-৪

১০। ঐ

পৃঃ-৪

১১। বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস

রেভারেন্ড প্রিয় কুমার বারুই

পৃঃ-১৯৫-১৯৯

১২। বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর

ইতিহাস

প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত

পৃঃ-৮০,৭৩, ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আমার গবেষণার অধ্যায়সমূহ সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

যথা ঃ-

১। খ্রীষ্ট ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

২। খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিভিন্ন বিভাগ, বিশ্বাস ও মতাদর্শগত পার্থক্য।

৩। দক্ষিণ এশিয়া বিশেষত বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাস ও ধর্মজীবন একটি পর্যালোচনা।

৪। দক্ষিণ এশিয়া বিশেষত বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের আগমনের পটভূমি বিশ্লেষণ আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা।

৫। বঙ্গভঙ্গ থেকে ভারত বিভাগঃ রাজনৈতিক পটভূমিতে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের কর্ম-কৌশল; তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক মাত্রা ।

৬। বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড।

৭। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের অবদানের ব্যাপ্তি ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়া ।

প্রভৃতি অধ্যায়সমূহের আলোচনায় আমি খ্রীষ্টান ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিভিন্ন বিভাগ এবং ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্টদের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য, খ্রীষ্টান মিশনারীদের আগমনের সময় তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাস এবং ধর্ম জীবন, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের আগমনের পটভূমি, বঙ্গভঙ্গ থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ইতিবৃত্ত সময় থেকে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্য কলাপ, বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড ও এদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের অবদান ও

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির ব্যাপক আলোচনা যাত্রায় আমি আলোচনায় যত্নবান হবার চেষ্টা করেছি মাত্র। যদি এ আলোচনা করতে গিয়ে কোথাও ভুলত্রুটি হয় তারজন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

"তোমার বর্তমান মাথা তুলে অতীতের
ভিতর দিয়ে,
তোমার ভবিষৎ জন্ম নেয় বর্তমান থেকে,
ইতিহাস করবে তোমায়
আত্মসচেতন,
কর্মে বীর্যবান,গবেষণায় নিপুন,"

উল্লেখ্য, বাংলদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের ইতিহাস আজ ও সুষ্ঠুভাবে লিখিত হয়নি। এক্ষেত্রে ডক্টর মহর আলী পথ প্রর্দশকের কাজ করেছেন কিন্তু সেখানেও বাংলাদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের সম্পর্কে বিশেষ করে ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ এর গতিপথে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্য কলাপের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়নি বিধায় আমার -এ- গবেষণার যাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

১.মিশনারীঃ ইংলিশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন

অষ্টাদশ শতক থেকে উনবিংশ শতকে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে নেতৃত্বে ছিলেন।

মিঃ এস পাওয়েল

মিঃ উইলিয়াম কেরী

মিঃ মুয়োর,

মিঃ কার্ণিশ,

রেভারেন্ড ওয়েন লেনার্ড,

রেভারেন্ড রবিনসন

ডাঃ হেবার্লিন, রেভারেন্ড রুপার্ট বিয়ন, রেভারেন্ড কার্ল সুপার ,

বিংশ শতক এর প্রথম দশক থেকে মাঝামাঝি সময়ে নেতৃত্বে ছিলেন।

মিঃ সি পিটার্স,

রেভাঃ জে, এলিসন

রেভাঃ জে, এম, দত্ত

রেভাঃ এস, কে,দে

রেভাঃ সামার্স, রেভাঃ আর ডব্লিউ এডমিডস্

রেভাঃ সি, ই, উইলসন

রেভাঃ এলিসন

রেভারেন্ড নল

মিসেস নল, রেভাঃ ডিক্রুজ,

Dhaka University Institutional Repository

রেভাঃ ম্যাকলিন, রেভাঃ ডোনাল্ড,

রেভাঃ জে, হিউজেস

ডাঃ টাইচম্যান, রেভাঃ রাইট হে,

রেভাঃ ডব্লিউ এস পেজ।

কর্মক্ষেত্রঃ-ঢাকা,দিনাজপুর, ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম,

বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা ও রংপুর।

২. মিশনারীঃ নিউজিল্যান্ড ব্যাপ্টিষ্ট মিশন

রেভাঃ জন টেকল

ডাঃ চার্লস নর্থ

মিস বেকিং সেল, মিস ম্যাকজর্জ

মিস পিলো, মিস বেকন,

মিঃ ডালমাস

রেভাঃ হিউজেস।

৩. মিশনারীঃ অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিষ্টমিশন

রেভাঃ গোল্ড স্যাক

মিসঃ আর্নল্ড

মিস টাক

রেভারেন্ড নল, রেভাঃ সাইলাস মিড।

কর্মক্ষেত্র ঃ পাবনা,কুমিল্লা, ফরিদপুর, নোয়াখালী।

Dhaka University Institutional Repository

৪.মিশনারীঃ অক্সফোর্ড মিশন

ফাদার ষ্ট্রং

ফাদার শোর

ফাদার ডগলাস,ফাদার কর্ণওয়ে।

এডিথ ল্যাংরিজ

হেষ্টারনক্স

ফ্যানী ওলনী, এডা এ্যাপেলবী

কর্মক্ষেত্রঃ-ঢাকা,বরিশাল।

৫.মিশনারীঃ ইংলিশ প্রেসবিটারীয়ান মিশন

ডাঃ ডোনাল্ড মরিসন

রেভারেন্ড বিহারী লাল সিংহ

রেভাঃ পি,কে, বারুই।

রেভাঃ হ্যামিলটন

ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড স্মিথ।

কর্মক্ষেত্রঃ রাজশাহী,সান্তাহার,নওগাঁ

৬.মিশনারীঃ ওয়েলশ প্রেসবিটারীয়ান মিশন

সি, টি আলেক জান্ডার

ডব্লিউ এম, আলেকজান্ডার

কর্মক্ষেত্র ঃ সিলেট, সুনামগঞ্জ,মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

৭.মিশনারীঃ চার্চেজ অব গড মিশন

মিসেস ভায়োলা কোভার

মিস, ভায়োলা হার্সী।

মিস, বেকার

মিস, উইট্স্ ম্যান

কর্মক্ষেত্র ঃ বগুড়া।

৮.মিশনারীঃ সেন্ট এন্ড্রুজ মিশন

আচার্য আর বিয়ন

আচার্য জে এলিসন

বাঙ্গালী

শ্রী যুক্ত জয়নাথ চৌধুরী

শ্রী যুক্ত রাখাল চন্দ্র ব্যাপারী

শ্রী যুক্ত আন্দ্রিয় পাঞ্জা

শ্রী যুক্ত জগবন্ধু।

কর্মক্ষেত্র ঃ ময়মনসিংহ হালুয়াঘাট, বিরিশিরি

৯. মিশনারীঃ লুথারেন মিশন

রেভারেন্ড এইচ, পি, ক্যাম্প

রেভাঃ পিটার ম্যাকনী

কর্মক্ষেত্র ঃরাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর।

Dhaka University Institutional Repository

১০. মিশনারীঃ এ্যাসেমব্লীজ অব গড মিশন

বঙ্গীয় ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের অর্ন্তভুক্ত মন্ডলীসমূহের দ্বারা এই মন্ডলী গঠিত হয়েছিল।

রেভারেন্ড জন দ্বিজরাজ ব্যানার্জী।

মিঃ হৃদয় রঞ্জন সমাদ্দার।

কর্মক্ষেত্র ঃ খুলনা, যশোহর, গোপালগঞ্জ।

১১. মিশনারীঃ এ্যাংলিকান মন্ডলী

আচার্য সিলভেষ্টর বেরয়রোর

রেভাঃ সেফার্ড।

মাদার মহেন্দ্র চক্রবর্তী

ফাদার আন্দ্রিয় পাঞ্জা

ফাদার মাইকেল

ব্রাদার ভূপাল সরকার

রেভারেন্ড মনোরঞ্জন সরকার

ডিকন বৃন্দাবন।

ফাদার প্রাইয়র

কর্মক্ষেত্র ঃ বরিশাল, ফরিদপুর।

১২.মিশনারীঃ রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী

ফাদার, ফ্রান্সিসকো ফার্নান্ডেজ।

Dhaka University Institutional Repository

ফাদার ,মেলকাইর দা ফনসেকা।

ফাদার, ম্যানরিক।

জেম আন্টেনীও রোজারিও

ফাদার, বাসিল আন্তনী মরো।

ফাদার, মাইকেল ফালিজ সি.এস.সি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে

ফাদার, বিশপ ল্যাগ্রান্ড

ফাদার, টিমথী ক্রাউলী (পরবর্তী কালে বিশপ)

ফাদার,ডেলনী

ফাদার, ম্যাংগেন

ফাদার, কাষ্টেল্লী

ফাদার, কার্নস

ফাদার, ফ্লরী,

ব্রাদার, ইউজিন,ব্রাদর এন্ড্রু,

ব্রাদার, যোয়াকীম

ব্রাদার, ওয়াল্টার প্রমূখগণ।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন মিশনের খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ এদেশে বিভিন্ন সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে গিয়েছেন এবং এই ধর্ম প্রচার কার্যে হয়তো আরো অনেক মিশনারী বা প্রচারক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন যাদের সকলের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি । যাই হোক, এই সকল ধর্ম প্রচারকদের সাথে বৃটিশ ঔপনিবেশিক

Dhaka University Institutional Repository

শাসন এর আন্ত সম্পর্ক কেমন ছিল তা না জানালে হয়তো এ অভিসন্দর্ভটি অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই-এ- প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার উপস্থাপন করা হলো।

উল্লেখ্য, মোগল আমলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের যে সমস্ত সওদাগরী প্রতিষ্ঠান ভারতীয় উপমহাদেশে বাণিজ্য করত সেই সকলের মধ্যে ইংল্যান্ডের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী উল্লেখযোগ্য ছিল। এদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে এদেশে মিশনারী তৎপরতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংরেজ শাসন এদেশে প্রোটেষ্টান্ট আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল যদিও ভারতবর্ষে মিশনারী পাঠাতে কোম্পানীর কোন অধিকার ছিল না। তথাপি কোম্পানীর সাথে এবং পরবর্তী সময়ে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের সাথে বিভিন্ন খ্রীষ্টান মিশনারীদের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক বজায় ছিল যার ফলে দেখ যায় যে, কোম্পানীর শাসনকালীন সময় ইংরেজ মিশনারী উইলিয়াম কেরীকে নীলকুটির ম্যানেজার পদে চাকুরী প্রদান। উল্লেখ্য আভ্যন্তরীন সম্পর্ক ছিল বিধায় বিভিন্ন মিশনারীদের কোম্পানী চাকুরী প্রদান করে প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম প্রচারে সহায়তা না করলেও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করত। তেমনিভাবে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এর সময়ে বিংশ শতকের প্রথম দিকে ওয়েলশ প্রেসবিটারীয়ান মিশন তৎকালীন পূর্ব বাংলার সিলেট জেলায় খ্রীষ্টীয় মন্ডলী স্থাপনের কাজ ''সফলতার সাথে সম্প্রসারিত করতে পেরেছিল।

ফলে সিলেট শহর সহ সুনামগঞ্জ,মৌলভী বাজার , হবিগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন সময়ে মন্ডলী স্থাপিত হয়।[১]

Dhaka University Institutional Repository

আর এ মন্ডলী স্থাপনে অর্থাৎ ''ওয়েলশ প্রেসবিটারীয়ান মিশনের কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন ইংরেজ চাকর সাহেব সি.টি. আলেকজান্ডার এবং তাঁর ভাই ডব্লিউ এম.আলেকজান্ডার।[২]

শুধু কি তাই? ''বৃটিশ শাসনের অবসানের আগেই বাংলাদেশের সকল এলাকায় খ্রীষ্টীয় মন্ডলী স্থাপিত হয়েছিল।আর তা সম্ভব হয়েছিল মিশনারীদের সাথে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আন্ত সম্পর্ক নীতি বজায় থাকার ফলেই।

''বৃটিশ রাজ্যের উদ্বত প্রশাসনিক ব্যবস্থাও সকল মিশন কাজের সহায়ক হয়েছিল''।[৩]

সুতরাং খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের সাথে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না এবং তা ছিল এদেশের অনেকের নিকট ইঞ্জিল বা সুখবরের মত।''[৪]''

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকাসমূহ

১। সমতান ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা

পৃঃ ১১।

২। pastor S.C. Datta- একটি ক্ষুদ্র মন্ডলীর কথা, নবযুগ চাঁদপুর

অক্টোবর, ১৯৬৮

পৃঃ ১০।

৩। These Forty years

H.H. Driver

P-17,

৪। ইঞ্জিল শরীফ

পৃঃ-৭

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

গ্রন্থপঞ্জীর বর্ণনা

১। আর তুরো স্পেজিয়ালে পিমে, ফাদার
নোয়াখালী খ্রীষ্ট মন্ডলীর ইতিহাস
১৫০০-১৯০০।

২। আর্চ বিশপ মাইকেল রোজারিও
স্মরণিকা ১৯৭৮ ইং।

৩। কে. এম. রাইছ উদ্দীন খান
বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা
নবম সংস্করণ, ১৯৯৯ ইং।

৪। দিলীপ পন্ডিত, প্রফেসর
বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
খ্রীষ্টীয়ান লিটারেচার সেন্টার
চাঁদপুর, কুমিল্লা।
প্রথম মুদ্রণঃ১৯৮৫ ইং।

৫। দাস, ক্ষিতীশ চন্দ্র
সত্যের সন্ধান, খুলনা
১৯৩৫ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৬। দানিয়েল লৌয়ারী, ফাদার
খ্রীষ্ট ধর্মীয় শব্দার্থ
সম্পদনাঃ ফাঃ সিলভানো গারেল্লো
প্রকাশ কালঃ১৯৯৬ ইং।

৭। রেভারেন্ড কে. কে. দাস
কুমারী এলেন আর্নল্ডের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

৮। রেভারেন্ড ডি. এ . চৌধুরী
ভারতীয় খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর নেতা ও অগ্রদূতগণ।

৯। রেভারেন্ড প্রিয় কুমার বারুই
বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর ইতিহাস
১৯৭৩ ইং।

১০। পেষ্টর এস, সি দত্ত
একটি ক্ষুদ্র মন্ডলীর কথা
নবযুগ, চাঁদপুর অক্টোবর
১৯৬৮ ইং।

১১। শ্রী পিতর সরকার
আলীম উদ্দীন ভুঁইয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী,
কলিকাতা , ১৯৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

১২। সম্পাদকঃ সিরাজুল ইসলাম।
বাংলাদেশের ইতিহাস
১৭০৪-১৯৭১
(অর্থনৈতিক)
২য় খন্ড।

১৩। সম্পাদকঃ সিরাজুল ইসলাম।
বাংলাদেশের ইতিহাস
১৭০৪-১৯৭১
(সামাজিক ও সাংস্কৃতিক)
৩য় খন্ড
সম্পাদক ঃ সিরাজুল ইসলাম।

১৪। খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর পালক সহচর
পঞ্চম সংস্করণ
১৯৯৩ ইং
বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট সংঘ কর্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৫। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল সমূহ
প্রকাশনা ঃ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনী
১ কাকরাইল রোড,
ঢাকা, বাংলাদেশ।
প্রকাশ কাল ,১৯৯০ ইং

Dhaka University Institutional Repository

১৬। ধর্ম বই

প্রতিবেশী প্রকাশনী

৬১/১ সুভাস বোস এভিনিও

লক্ষী বাজার, ঢাকা।

১৭। প্রতিবেশী ক্রোড় পত্র

বিশ্বাস বিস্তার, রবিবার-১৯৭৭ ইং।

১৮। দীপ্ত সাক্ষ্য, ১৬শ বর্ষ

ডিসেম্বর ১৯৯০ ই ং।

১৯। ইসলামী বিশ্বকোষ

৫ম খন্ড ।

২০। নবযুগ চাঁদপুর , জুলাই ১৯৩৬ ইং ।

২১। নবযুগ চাঁদপুর , আগষ্ট ১৯৩৬ ইং।

২২। নবযুগ চাঁদপুর , অক্টোবর ১৯৩৬ ইং।

২৩। নবযুগ চাঁদপুর , নভেম্বর ১৯৩৮ ইং।

২৪। নবযুগ চাঁদপুর , অক্টোবর ১৯৩৯ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

২৫। নবযুগ চাঁদপুর , ডিসেম্বর ১৯৩৯ ইং।

২৬। মথি ১৬ঃ ১৮।

২৭। মন্ডলীর আইন ধারা ৩৩১।

২৮। প্রতিবেশী,ঢাকা।

২৯। নবায়ন,কলিকাতা।

৩০। সমতান,ঢাকা।

৩১। B, B, U এর সম্পাদক
মিঃ সাইমন মুন্সীর প্রেরিত তথ্য।

৩২। রেভারেন্ড সামার্সের তথ্য।

৩৩। ইঞ্জিল শরীফ।
বি, বি, এস
১৯৮০ ইং।

৩৪। প্রোটেষ্টান্ট ফাদার মৃত টমাস
মনিমোহন বৈদ্য ও ক্যাথলিক
ফাদার বার্ণাড পালমার তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। Ali syed Murtaza
History of chittagong
1964.

৩৬। Austin Flannery
(General Editor)
The documents of Vatican II
Dominican publications
Dublin / Ireland -1975.

৩৭। Bosch D.
witness to the world, The
christian Mission in Theological
perspective,
Atlanta G. A. john Knox
1980.

৩৮। Boettener , Loraine
roman catholicism
London, 1966.

৩৯। Capmos, j. j. A

Dhaka University Institutional Repository

History of partugues in
Bengal, 1919.

৪০। H. H driver
A hundred years in
Bangladesh.

৪১। John and Hinnells
A hand book of living religions
Viking
pub:-1984.

৪২। Karim, A. Z. N
The Modern Muslim Political Elite in Bengal
University of London.

৪৩। Mc, Nee
crucial Issues in Bangladesh
1976.

৪৪। Smith , V.A
Oxford history of India
1958.

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। Sarker , sir, Jadunath
History of Bengal
Voll II
Dhaka University.

৪৬। Viola G, Hershy
Glmpses of Bogra
Harishburg, 1912.

৪৭। The dutch East India company
and the Economy of Bengal
1630-1720.

৪৮। Bangladesh Itihas samity
Historical studies voll-III
1974.

৪৯। পত্রিকা ঐক্যতান, ঢাকা ১৯৬১।

৫০। ক্যাথলিক পঞ্জিকা, ঢাকা ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাসঙ্গিক বই সমূহ

৫১। কস্তা, যে, রোম ডি
বাংলাদেশে কাথলিক মন্ডলী
প্রথম খন্ড
আগষ্ট , ১৯৮৮ ইং।

৫২। খান, মুহম্মদ সিদ্দিক
বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা
সাহিত্য পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শীত সংখ্যা
১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

৫৩। দোম, আন্তে নিও , দো রোজারিও
ব্রাহ্মন রোমান ক্যাথলিক সংবাদ
ভূষণার রাজপুত্র
শ্রী সুরেন্দ্র নাথ সেন
কর্তৃক সম্পাদিত
১৯৩৭ সাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৪। বদরুদ্দীন ওমর
বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি
নভেম্বর , ১৯৮৭ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫। বৈদ্য, টমাস মনিমোহন
বাংলাদেশ সেবক সমিতির ইতিহাস
প্রথম মুদ্রণ, ১৯৮৬ ইং

৫৬। বার্ণাড পালমা, ফাদার
খ্রীষ্টের দেহ গ্রহণ ও মানব কৃষ্টির
তাৎপর্য দীপ্ত সাক্ষ্য , জাতীয়
উচ্চ সেমিনারীর সম্পাদক মন্ডলী
বনানী, ঢাকা ১৯৮৭ ইং।

৫৭। মেহের উল্লাহ্ মুন্সী , মুহম্মদ
রদ্দে খ্রীষ্টান ও দলিলুল ইসলাম
ঢাকা, ১৯৭৬ ইং।

৫৮। যোয়াকিম রোজারিও, সি এস, সি,
বাংলাদেশ ও খ্রীষ্ট মন্ডলী
প্রকাশনা যাজক সম্মিলনী চট্টগ্রাম ধর্ম প্রদেশ
প্রকাশ ঃ ১৯৮৮ ইং।

৫৯। রমেশ চন্দ্র মুজমদার
বাংলাদেশের ইতিহাস তৃতীয় খন্ড
১৯৭১ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৬০। রেভা ঃ সুভাস চন্দ্র সাংমা
গারো ব্যাপ্টিষ্ট কনভেনশনের ইতিহাস
প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯০ ইং।

৬১। রেভাঃ রাজেন্দ্রনাথ বারৈ
ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের ইতিহাস
প্রকাশকাল, জানুয়ারী ১৯৮৪ ইং।

৬২। লুইজি পিনেস পিমে, ফাদার
উত্তর বঙ্গে ক্যাথলিক মন্ডলীর শুভ সূচনা
ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ।
প্রকাশ কালঃ মার্চ, ১৯৯৬ ইং
প্রকাশনায় পিমে ফাদারগণ।

৬৩। শ্রদ্ধেয়, চৌধুরী ডি, এ
ভারতীয় খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর নেতা ও অগ্রদুতগণ
কলিকাতা -১৯৪৪ ইং।

৬৪। শ্রদ্ধেয়, ডক্টর ওয়াকিল আহমেদ
বাংলার লোক সংস্কৃতি, বাংলা
একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫। সরকার অনিল কুমার
আমাদের নেতৃবর্গ
কলিকাতা ১৯৬২ ইং।

৬৬। খ্রীষ্টেতে ঐক্য ও আশা চার্চ অব বাংলাদেশ

৬৭। মুক্তি দাতার প্রেরণ ও প্রেরণ কার্য
REDEMPTORIS MISSION
মন্ডলীর প্রেরণমূলক নির্দেশের
চিরন্তন সত্য বিষয়ক পত্র
১৯৯১ ইং।
অক্টোবর ২১,২৫।

৬৮। স্মরণিকা
নোয়াখালী খ্রীষ্ট মন্ডলীর ইতিকথা
(১৯৪৩-১৯৯৩ইং)।

৬৯। জীবন ধ্যান ও সেবায় মিলন আনন্দ
বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান
১৯৯৬ ইং
স্মরণিকা ৬ই সেপ্টেম্বর
বিশপ ভবন, দিনাজপুর।

Dhaka University Institutional Repository

৭০। উপাসনা সহায়ক পত্রিকা
ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা
বাংলাদেশ উপাসনা পরিষদ
বনানী, ঢাকা ১৯৮৬ ইং।

৭১। বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ সংঘ
স্মরণিকা ১৮৫৩-১৯৭৮
বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ সংঘের
১২৫ বছর, ঢাকা।

৭২। বঙ্গে খ্রীষ্ট মন্ডলী
রচনাকাল ১৮৯২
লেখক অজ্ঞাত
প্রকাশকঃ বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট
সংঘ, ব্যাপ্টিষ্ট মিশন, সদরঘাট
ঢাকা।

৭৩। প্রতিবেশী ,ঢাকা।

৭৪। তেজগাঁও প্যারিশে রক্ষিত ডায়েরী।

৭৫। বাইবেল।

৭৬। ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা
১৯৭৬ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৭৭। সুহৃদ (এ্যাংলিকান মন্ডলীর পত্রিকা)
১৯৩৬ ইং।

৭৮। স্মরণিকা
নটরডেম কলেজ বার্ষিকী
১৯৯৯ইং।

৭৯। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা
ইতিহাস সম্মেলন
১৯৯৬ ইং।

৮০। ঐ
১৯৯৮ ইং।

৮১। Anonymous
A handred Years in Bengal
A histroy of the oxford Mission
1880-1908
Delhi, 1979.

৮২। Carey S.Pearce
William carey , 1761-1834
London 1923.

Dhaka University Institutional Repository

৮৩। Cris Well, W.A.
The Baptism , Filling and Gifts of the holy spirit
michigan , 1973.

৮৪। Dani, A.H.
Dhaka, A record of its
changing fortunes, Dhaka, 1959.

৮৫। Driver , H, H
These forty Years, A
brief history of the N. Z. B.M.S
Dunedin, N.Z. 1927.

৮৬। Jonathan Lindell
Nepal and the Gospal of God.

৮৭। Kamaruddin Ahmed
The social history of East pakistan.

৮৮। Mc kinley, Jim
Death to life; Bangladesh
Dhaka 1979.

Dhaka University Institutional Repository

৮৯। Respected, Hays
moon and way land
world History , 1955.

৯০। Sufia Ahmed, Doctor.
Muslim Community in Bengal 1884-1912.

৯১। Soddy, Gordon
Baptist in Bangladesh
Pub: michal Sushil Adikari, 1978.

৯২। Takol , Reverend
Shiratul Mustaqim
Y.M. C. A. India.

৯৩। Takol, Reverend
At Tariqat
Y.M. C. A. India.

৯৪। W. Slavin , Father
Three Peoples in one Church
Pradipan, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

৯৫। Walker F. deaville
William carry, Missionary
Pioneer and statesman
Chicago, 1925.

৯৬। The N. Z. Baptist Jubilee
Issue, 1935.

৯৭। The N. Z. Baptist Jubilee
Issue, 1945.

৯৮। Catholic Encyclopedia 1914
Vol-III Calcutta
Vol,N- Dhaka.

৯৯। The Congregation of Holy Cross
in the Diocese of Dacca
Rev. Raymond J. Clancy, C.S.C.
Washington D. C. 1948.

১০০। The Catholic Directory of Bangladesh,
Dacca-1973.